ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

আঠারোশো বাষট্টি সালের জানুয়ারি মাস.....3
ডক্টর ফার্গুসনের একমাত্র বন্ধু.....10
জো – ফার্গুসনের চিরসাথী ও বিশ্বস্ত অনুচর.....19
রেজোলিউট বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো.....24
আবহাওয়া পরিষ্কার, বাতাস অনুকুল, সমুদ্রও শান্ত.....28
নীল আকাশে তুলোর পাঁজার মতো শাদা মেঘ.....35
রাত কেটে গেলো নিরাপদেই.....42
প্রবল এক বাতাসের বেগ.....49
ডাইনি-পুরতরা.....54
ডিকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ফার্গুসন.....59
জো বেশ জমকালো ভঙ্গিতে.....62
আকাশ একেবারে পরিষ্কার.....72
দূরে মিলিয়ে গেলো নীলনদ.....80

কেবল মরা ধূলোর মরুভূমি.....88

যখন বেলুনকে আকাশে তোলা হলো.....94

জো কোনো কথা বলেনি.....97

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর.....101

হয়তো বেঁচে আছে জো.....109

দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখে.....116

সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে আর কতদিন.....127

বেলুন এবারে কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে.....135

জিনিশপত্র সব ফেলে দিয়ে বেলুনকে হালকা.....141

বেলুনের সব গ্যাসই ফুরিয়ে গেলো.....147

অবশিষ্ট.....152

আঠারোশো বাষট্টি সালের জানুয়ারি মাস

আঠারোশো বাষট্টি সালের জানুয়ারি মাসে রয়্যল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সংসদভবনে একটা মস্ত সভার আয়োজন হয়েছিলো। প্রথম থেকেই শ্রোতারা অত্যন্ত কৌতূহলী ও উৎসুক হয়ে ছিলো, সভাপতির উদ্দীপ্ত বক্তৃতা শুনতে-শুনতে তারা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। হাততালির প্রবল আওয়াজ আর প্রশংসার একটানা গুঞ্জনে সভাঘর অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখরিত হয়ে গেলো। বক্তৃতা শেষ করে বসবার আগে সভাপতি বললেন, ভৌগোলিক অভিযানে ইংরেজরাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আসন। দখল করেছে। ইংলণ্ডের সেই গৌরব শিগগিরই আরো বাড়িয়ে দেবেন ডক্টর ফার্গুসন। যে-কাজ সফল করে তোলার চেষ্টা তিনি করছেন, (শ্রোতাদের একজন চটপট বলে উঠলো, তা যে সফল হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই,) তা সফল হলে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্র অচিরেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে দেখা দেবে। আর যদি তার সকল চেষ্টাই বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি তার সব উদ্যমই ব্যর্থতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়, তাহলেও তার পরাজয় এ-কথাই আরেকবার প্রমাণ করে দেবে যে, দুঃসাহসে ভর দিয়ে যে-কোনো কাজেই রত হতে পারে বলে জীবকুলের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ।

বক্তৃতা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই ডক্টর ফার্গুসনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে সকলে মুখর হয়ে উঠলো। তক্ষুনি অভিযানের খরচ জোগাবার জন্যে চাঁদা সংগৃহীত হতে লাগলো। দেখতে-দেখতে তার অভিযানের জন্যে সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো তিন পাউণ্ড জোগাড় হয়ে গেলো। জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন সভ্য সভাপতিকে জিগেস করলেন, ডক্টর ফার্গুসন কি আমাদের সামনে একবারও বেরুবেন না?

কেন বেরুবেন না! সবাই যদি চান তো এক্ষুনি তিনি এখানে আসতে পারেন।

সভাঘরের চারদিকেই তুমুল শোরগোল উঠে গেলো, আমরা একবার ডক্টর ফার্গুসনকে চোখে দেখতে চাই!

একজন ছিলো একটু সেয়ানা গোছের চালিয়াৎ, সে তো বলেই দিলে, ধুর, ধুর–ফার্গুসন নামে কোনো লোকই নেই–ও-সব ধাপ্পা, নিছক বাজেকথা।

আরেকজন আবার সেইসঙ্গে ফোড়ন কাটলে, ঠিকই বলেছো। কেন তোমরা বুঝতে পারছে না যে এ-সবই বুজরুকি।

তখন সভাপতি বললেন, ডক্টর ফার্গুসন, আপনি যদি দয়া করে একবার মঞ্চে এসে দাঁড়ান তো ভালো হয়। এরা সবাই আপনাকে একবার দেখতে চাচ্ছেন।

তক্ষুনি গম্ভীর চেহারার এক ভদ্রলোক স্থির পায়ে মঞ্চের উপর এসে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতারা সোল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলো। ফার্গুসনের বয়েস চল্লিশের কিছু কম, শক্ত সুঠাম শরীর, তীক্ষ্ণ নাকে বুদ্ধির ছাপ, আর চোয়ালের চৌকো হাড়ের রেখায় একধরনের দৃঢ়তা মিশে আছে। কোমল চোখে ঝলমল করছে বুদ্ধি, বাহুযুগল দীর্ঘ, আর কাঁধের হাড় মস্ত আর চওড়া। তার পা দেখেই দর্শকেরা আন্দাজ করে নিলে যে, হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পর্যটন করার ক্ষমতা তার আছে বটে। ফার্গুসন সভাপতির পাশে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের কোলাহল ভীষণ বেড়ে গেলো। হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন ফার্গুসন, তারপর ডানহাতের তর্জনী শূন্যে তুলে বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

তার এই একটি কথায় শ্রোতারা যেমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ক্যাডেন বা ব্রাইটের হাজার বক্তৃতাতেও তা কখনও হয়নি। এই-যে ফার্গুসন, যিনি পলকের মধ্যে সহস্রের হৃদয় জয় করে নিলেন, তার পরিচয় নানা কারণেই নিশ্চয়ই পাঠকদের অজ্ঞাত নেই।

ফার্গুসনের বাবা ছিলেন ইংরেজ নৌবহরের একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষ। ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রে দিন কাটিয়েছেন ফার্গুসন। এমনকী তুমুল লড়াই চলবার সময়েও ছেলেকে কাছোড়া করতেন না তার বাবা। তখন থেকেই ফার্গুসন সব বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করতে শিখেছেন। একটু বয়েস হতেই ফার্গুসন দিনরাত অ্যাডভেনচারের বই নিয়ে সময় কাটাতে শুরু করে দেন। সে-সব অ্যাডভেনচারের বইয়ে গাজাখুরি ও আজগবি রোমাঞ্চকর উপ্যাখ্যান থাকতো না, থাকতত বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। হাজার বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করে অজ্ঞাতের সন্ধানে বেরিয়েছেন তারা, পদে-পদে নানারকম বিপত্তি ও দুর্দৈবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে তাদের, তবু কেউ এক পাও পিছনে হঠে যেতে রাজি হননি; একবারে না-পারলে আবার বেরিয়েছেন তারা, শেষকালে হয়তো মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু সব সত্ত্বেও একটুও পেছিয়ে যাননি। এইসব বই বালক ফার্গুসনের কল্পনাকে চেতিয়ে দিতে, উসকে দিতে তার মন, আর তখন থেকেই ভেতরে-ভেতরে নিজেকে সেইসব নায়কদের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিতেন। সেইসব বাধা-বিপত্তি বিপদ-আপদ তাঁকে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় ভরে দিতো সত্যি, কিন্তু সেইসব বিপদ-আপদের হাত থেকে তারা যেভাবে নিজেদের উদ্ধার করতেন, তা তাঁকে বিস্তর আমোদ ও আনন্দ দিতো। তবে মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হতো এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে নিশ্চয়ই আরো সহজে উদ্ধার লাভ করতে পারতেন। ছেলের মনের ধাত বা চেহারা বাবার অজ্ঞাত ছিলো না। নানা ধরনের

বিজ্ঞানশিক্ষায় ছেলে যাতে বুৎপত্তি লাভ করে, সেইজন্যে প্রথম থেকেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে, মৌমাছিরা যেমন করে বহুকিছু থেকে মধু সংগ্রহ করে একটু-একটু করে মৌচাক গড়ে তোলে, তেমনিভাবে নানা বিদ্যা থেকে মানসিক খাদ্য নিষ্কাশন করে ফার্গুসনের বিদগ্ধ মানস গড়ে উঠেছিলো।

পিতার মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে ফার্গুসন ভারতবর্ষে বাংলাদেশে এলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর রুটিন-বাঁধা, একঘেয়ে, কাজ তাকে বিষম অরুচিতে ও বিতৃষ্ণায় ভরে দিলে। তরবারি পরিত্যাগ করে অচিরেই তিনি পর্যটক হয়ে উঠলেন, তারপর গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে তাঁর আর খুব-বেশি দিন লাগলো না। দেশ ঘোরার ইচ্ছেটা তার এতই প্রবল ছিলো যে একদিন সকালে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে সরাসরি সুরাটের দিকে রওনা হলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণ সাঙ্গ করে ক্রমেক্রমে রুশদেশ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াও ঘুরে এলেন তিনি। কোনো কিছুতেই তার কোনো অসুবিধে হতো না। অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে, তবু হাল ছেড়ে দিয়ে পেছ-পা হননি। ঘুম তো ছিলো যেন তার হুকুমের চাকর, তার কথাতেই যেন ওঠ-বোস করতো। সময়ে-অসময়ে সুবিধেয়-অসুবিধেয় সংকীর্ণ স্থানে কি প্রশস্ত জায়গায় যখন যতটুকু দরকার ততটুকু ঘুমুতে পারতেন তিনি-ঠিক নাপোলিয়র মতো।

বিশেষ-কোনো সমিতির সভ্য না-হওয়া সত্ত্বেও ডেইলি টেলিগ্রাফে নিয়মিত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতেন বলে জনসমাজে ফার্গুসন সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু লোকে তার নাম জানলেও খুব কম লোকের সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো। কোনো সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে, কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তিনি একটুও সময় নষ্ট করতেন না। ভাবতেন, যতক্ষণ সভায় বসে তর্কাতর্কি করে খামকা সময় নষ্ট করবো, ততক্ষণ কোনো-একটা

তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করলে ঢের বেশি কাজ দেবে। পর্যটক ফাণ্ডসন যা দেখতেন, তার একেবারে অন্তঃস্থল পর্যন্ত না-দেখে ছাড়তেন না। সেই কারণে সাধারণ পর্যটকদের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য ছিলো।

একদিন ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখলে :

এতদিনে নির্জন আফ্রিকার কালো অবগুণ্ঠন খুলে যাবে, এতদিনে নীরবতা ভেঙে কথা কয়ে উঠবে উষ্ণ জঙ্গলের মৌন অন্ধকার। ছ-হাজার বছর ধরে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেও যার সন্ধান মেলেনি, এবারে, এতদিনে, সত্যিই, তা সব আবরণ উন্মোচিত করে দেখা দেবে। নীলনদের উৎস আবিষ্কার করার চেষ্টা এতকাল শুধু অসম্ভব ও বাতুল কল্পনা বলেই পরিচিত ছিলো। বহুকালের চেষ্টায় মাত্র তিনটে প্রবেশপথ মুক্ত হয়েছিলো কালো আফ্রিকার। ডেনহ্যাম ও ক্ল্যাপারটনের আবিষ্কার-করা পথে মাত্র সুদান পর্যন্ত গিয়েছিলেন ডক্টর লিভিংস্টোন; ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট ও ক্যাপ্টেন স্পীক ভিন্ন একটি পথ দিয়ে আফ্রিকার কয়েকটি হ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন। যেখানে এসে পথ তিনটে মিলেছে, সেটাই আফ্রিকার মধ্যখান বলে সকলের ধারণা। শিগগিরই আফ্রিকার এই ত্রিবাহুসংগমে যাত্রা করছেন ডক্টর ফার্গুসন। তিনি স্থির করেছেন, পূর্বআফ্রিকা থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত গোটা এলাকাটাই তিনি আকাশযানে করে যাবেন। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ফাসন ঠিক করেছেন তিনি জাজিবার থেকে বেলুনে করে বরাবর পশ্চিমমুখো যাবেন। এই যাত্রা যে কোথায় এবং কীভাবে শেষ হবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই বীর পর্যটকের সাফল্য কামনা করছি।

ডেইলি টেলিগ্রাফে এ-খবরটা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা দেশে দস্তুরমতো হৈচৈ পড়ে গেলো। অনেকেই বললে, এ একেবারে অসম্ভব কথা। অমন করে কি বেলুনে চড়ে একটা আস্ত মহাদেশে যাওয়া যায় নাকি কখনও! আসলে ফার্গুসন বলে কেউ নেই, ওটা কারু ছদ্মনাম, ডেইলি টেলিগ্রাফে সে প্রবন্ধ লিখতে। এই সুযোগে কাগজের কাটতি বাড়াবার জন্যে ডেইলি টেলিগ্রাফে সে এই বুজরুকি তুলে দিয়েছে। সম্পাদক মশাইকে তো চিনি, একবার অমনি একটা হুজুগ তুলে তিনি আমেরিকার মাথা খেয়েছিলেন, এবার দেখছি ইংলণ্ডেরও মাথা খেতে বসেছেন। অন্যান্য খবরের কাগজও একটা সুযোগ পেয়ে গেলো, তারা ডেইলি টেলিগ্রাফকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নানা ধরনের প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করতে শুরু করে দিলে। ফার্গুসন অবশ্য যথারীতি চুপচাপই থাকলেন, এই ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না।

কিছুকাল পরে সবাই যখন শুনতে পেলে যে, সত্যিই সুবিখ্যাত লায়ন কম্পানি ফার্গুসনের বেলুন তৈরির ভার নিয়েছে আর ইংরেজ সরকার রেজোলিউট নামে আস্ত একটি জাহাজ ফার্গুসনের ব্যবহারের জন্যে নিযোজিত করেছে, তখনই সকল সন্দেহ দূর হয়ে চারদিকে তুমুল সাড়া পড়ে গেলো। এই খবরটাও প্রথম প্রকাশ করেছিলো ডেইলি টেলিগ্রাফ; খবরটার যথার্থতা নিয়ে কেননা প্রশ্নই যখন করা গেলো না, তখন হু-হু করে তার কাটতি বেড়ে গিয়ে কাগজের মালিকরা রীতিমতো কেঁপে উঠলেন।

সারা ইংলণ্ডে এই নিয়ে বাজি ধরা শুরু হয়ে গেলো। সত্যিই ফার্গুসন নামে কেউ আছেন কি না, প্রথমে বাজি ধরা হলো তা নিয়ে; দু-নম্বর বাজির বিষয় হলো, এমন একটি অসম্ভব ও দুঃসাহসী অভিযানে সত্যিই কেউ শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হবে কি, এই প্রশ্ন; পর্যটন

সফল হবে কি না, ফার্গুসন আর ইংলণ্ডে ফিরতে পারবেন কি, এইসব নিয়েও বাজি ধরা হতে লাগলো।

প্রত্যেকদিন দলে-দলে লোক এসে ফার্গুসনকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ও উত্ত্যক্ত করে তুললে। অনেকে আবার নানা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দিলে না, তারা আবার তার সঙ্গে যাবার জন্যেও আব্দার ধরতে লাগলো। ফার্গুসন যদিও স্থিরভাবে সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিলেন, তবু একটি ব্যাপারে একেবারে অবিচল থেকে গেলেন-কাউকেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না।

ডক্টর ফার্গুসনের একমাত্র বন্ধু

ডক্টর ফার্গুসনের একমাত্র বন্ধু যিনি ছিলেন, তিনি ডিক কেনেডি। ধ্যান-ধারণা, প্রবণতা ও স্বভাব দু-জনের একেবারে অন্যরকম, কোনো দিকেই প্রায় মেলে না; কিন্তু তবু তাঁদের ভিতর প্রীতির কোনো অভাব ছিলো না। কতগুলো দিকে আবার দুজনের খুব খাপ খেতো : ডিক কেনেডি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সরলচিত্ত, কোনো ঘোরপ্যাঁচ জটিলতা নেই, একবার যা করবেন বলে ধরেন কখনও তা শেষ না-করে ছাড়েন না। শিকারি হিশেবে গোটা এডিনবরায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না। তিনি থাকতেন এডিনবরার লিথি নামক স্থানে। তার টিপ এমনি অব্যর্থ আর অমোঘ ছিলো যে, দূরে একটা ছুরি রেখে তিনি বন্দুকের এক গুলিতে ছুরিটাকে দুই সমান ভাগে টুকরো করে দিতে পারতেন। সুপুরুষ, শাদাসিধে, সরল এবং দুঃসাহসী ডিক কেনেডি তার ডাকাবুকো বন্ধু ফার্গুসনকে খুবই ভালোবাসতেন।

তিব্বত-ভ্রমণের পর ফার্গুসন দু-বছর চুপচাপ বসে ছিলেন, আর-কোথাও ভ্রমণ করতে বেরোননি। তাই দেখে ডিক ভেবেছিলেন, বন্ধুর বেড়াবার নেশা বোধহয় এতদিনে শেষ হলো। তাতে তিনি মনে-মনে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। দেখা হলেই তিনি ফার্গুসনকে কেবলই বলতেন, আর ছুটোছুটি করে কাজ নেই, বিজ্ঞানের জন্যে অনেক করেছো, এবারে দু-দিন ঘর-সংসারে মন দাও দেখি। ফার্গুসন মাঝে-মাঝে এ-কথা শুনে মৃদু হাসতেন, কখনও আবার চুপ করে কী যেন ভাবতেন, বন্ধুর কথার সরাসরি কোনো উত্তর দিতেন না।

ডক্টর স্যামুয়েল ফার্গুসনের সঙ্গে ডিক কেনেডির পরিচয় হয়েছিলো ভারতবর্ষে। সেনাবাহিনীর একই বিভাগে কাজ করতেন দুজনে, কিছুকাল একই শিবিরেও কাটিয়েছিলেন। সবসময়েই শিকার নিয়ে মত্ত থাকতেন ডিক, আর ফার্গুসন কেবলই যতরাজ্যের পোকামাকড় আর নানা জাতের গাছপালার স্বভাব, প্রকৃতি, প্রবণতা এইসবই অনুসন্ধান করে বেড়াতেন। দুজনে দুজনের জন্যে এমন-কোনো কাজই করেননি যা তাদের বন্ধুতার মূল কারণ হতে পারে, কিন্তু তবু-প্রায় সব বিষয়েই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও—দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুতা হয়েছিলো। অনেকে ভাবতে পারে যে দুজনে যখন একই বাহিনীতে কাজ করতেন, তখন হয়তো পরস্পরকে তারা কখনও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, বা কোনোরকম পারস্পরিক উপকারের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু তা সত্য নয়। দুজনের মধ্যে দেখাশোনাও হতো কচিৎ কখনও, কিন্তু তবু যখনই ফার্গুসন তার মস্ত এক একটি অভিযানের পর ইংলণ্ডে ফিরে আসতেন, তখনই ছুটতেন ডিক কেনেডির বাড়ি। যতদিন-না সেখানে কয়েকদিন কাটানো যায় ততদিন যেন আর তার মনের অস্বস্তি ও অস্থিরতা কাটবে না।

লামাদের দেশ থেকে প্রাণ হাতে করে ফিরে আসার পর বছর-দুয়েক ফার্গুসন টু-শব্দটি না-করে পড়াশুনো নিয়ে কাটাচ্ছিলেন দেখে ডিক মনে-মনে স্বস্তি অনুভব করছিলেন। এতদিনে তবে সত্যিই ডাকাবুকো বার-মুখো ফার্গুসন ঘরের দিকে মন দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় ফার্গুসনের সংকল্পিত অভিযানের কথা পড়ে তার সব ধারণা চুরমার হয়ে গেলো। প্রথমটা অন্য-অনেকের মতো তিনিও খবরটিকে আজগুবি বলে ভেবেছিলেন। কেননা বেলুনে করে আফ্রিকা পাড়ি দেবার মতো ও-রকম একটা ভীষণ সংকল্প কেবল পাগলেই করতে পারে। নেহাৎ যদি মাথায় পোকা না-ঢোকে তো কেউ কোনোদিন বেলুনে করে আভিযানের কথা ভাবতে পারে? তাছাড়া কয়েকদিন

আগেই তো ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, তখন তো কই এ-রকম কোনো সংকল্পের কথা মুখেও আনেননি ফার্গুসন! খবরটা বিস্তারিতভাবে পড়ার পরে কিন্তু ডিকের ভুল ভেঙে গেলো। তাহলে কি এইরকম একটা মারাত্মক মৎলব আটছিলেন বলেই ফার্গুসন দু-বছর চুপচাপ বসে ছিলেন? এর পরে হয়তো কোনোদিন বন্ধুটি চন্দ্রলোকে যাবার জন্যেও বায়না ধরে বসবেন।

অস্বস্তিতে ভরে গেলেন ডিক। না, যেমন করেই হোক, এই সংকল্প থেকে ফার্গুসনকে নিবৃত্ত করতেই হবে। জীবন যে কখন কোনদিক থেকে অভাবনীয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তা কে জানে। হয়তো ফার্গুসন তার সংকল্প থেকে মোটেই টলবেন না, কিন্তু তবু একবার তাকে ফেরাবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? না, আজই যেতে হয় দেখছি।

একটু রাগও হলো ডিকের। এই-ই যদি তার উদ্দেশ্য হবে, তবে আগে সে-কথা ডিককে বলতে কী দোষ হয়েছিলো? বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এই খবরটা ডিককে কিনা খবরের কাগজ পড়ে জানতে হলো! এত লোকজানাজানি হবার আগে ডিক যদি একথা একবার জানতে পারতেন, তবে হয়তো অনায়াসেই তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারতেন। কিন্তু এখন, এত হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাওয়ার পর, তা কি আর সম্ভব হবে?

ডিক আর-একটুও দেরি না-করে রেলের টিকিট কেটে সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে গাড়িতে চেপে বসলেন। যথাসময়ে পরদিন সকালবেলায় লণ্ডনে এসে পৌঁছুলেন তিনি, তারপর সোজা গাড়ি করে গ্রীক স্ট্রিটে ফার্গুসনের বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

ডিক কেনেডিকে হঠাৎ এসে হাজির হতে দেখে ফার্গুসন যৎকিঞ্চিৎ অবাক হলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। মুখে কেবল বললেন, হঠাৎ তুমি যে? কী ব্যাপার? শিকার ছেড়ে হঠাৎ লণ্ডনে কী জন্যে?

ডিক একটু রাগি গলায় উত্তর দিলেন, আচ্ছা, তোমার কি কখনও কাণ্ডজ্ঞান হবে। না, ফার্গুসন? বুদ্ধিশুদ্ধি কি সব লোপ পেয়ে গেছে? কী-সব যা-তা কথা বলে বেড়াচ্ছো? পাগলের মতো তোমার মাথায় পোকা ঢুকেছে বলেই হন্তদন্ত হয়ে আমাকে এই বিচ্ছিরি আর ঘিঞ্জি লণ্ডন শহরে আসতে হলো।

আমার মাথায় পোকা ঢুকেছে বলে? ফার্গুসন একটু হাসলেন। ও, কাগজে বুঝি খবরটা পড়েছো? তা সে নিয়ে পরে কথা হবে, আগে তো মাথা ঠাণ্ডা করে গুছিয়ে বোসো।

সে-সব ভদ্রতা পরে দেখা যাবে। ডিক বললেন, তাহলে সত্যিই তুমি আফ্রিকা যাচ্ছো?

তা তো যাচ্ছিই। সব ব্যবস্থাও মোটামুটি হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারির ষোলো তারিখে গ্রীনউইচ থেকে রেজোলিউট জাহাজ ছাড়বে—ঐ জাহাজে করেই জানজিবার অব্দি যাবো আমি।

সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে তাহলে, না? আর রাগ-চাপতে পারলেন না ডিক। জানো, তোমার সমস্ত ব্যবস্থা আমি লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারি।

অত মাথা-গরম কোরো না, ডিক। ফাণ্ডসন আবার হাসলেন। তোমার এত রাগের কারণ আমি জানি! এই নতুন অভিযানের পরিকল্পনাটি কেন আগে থেকে তোমাকে জানাইনি—তোমার এত রাগের কারণ তো তা-ই!

নতুন অভিযান গোল্লায় যাক। আমি বলছি, তোমার যাওয়া হবে না-স্বাস, সব গোল চুকে গেলো। এর মধ্যে আবার মনস্তত্ত্বের কথা ওঠে কোত্থেকে?

সে-কি! আমি যে এবারে তোমাকেও সঙ্গে নেবো ঠিক করেছি। জানো তো, যে-সে জায়গা নয়, আফ্রিকা। বুনো জানোয়ারদের হাতে পড়ে যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণ হারাতে হতে পারে। কাজেই সঙ্গে এমন-একজন লোক চাই, যার বন্দুকের টিপ একেবারে মোক্ষম এবং শিকারে যার কোনোকালেই অনীহা দেখা দেবে না, আর যার সাহসের তুলনা হয় না। আর সে-রকম লোক, আমার হিশেবে, সারা ইংলণ্ডে একজনই আছে—সে তুমি। কাজেই তোমাকে সঙ্গে নেবার কথা গোড়া থেকেই আমি মনে-মনে ভাবছিলুম। আজ যদি তুমি না-আসতে তো আমিই তোমাকে এখানে আসার জন্যে তার করে দিতুম। তাছাড়া, এই তো সেদিন তুমি আপশোশ করে বলেছিলে, এমনএক দেশে আছে যেখানে কোনো শিকার মেলা দুর্লভ, যেখানে শিকার করে আনন্দ নেই; বিপদ-আপদ মৃত্যুর আশঙ্কা—এ-সবই যদি না-থাকলো তাহলে আর শিকার করার মধ্যে উত্তেজনার খোরাক কী আছে। তাই বলছি, চলো আমার সঙ্গে, দেখা যাবে কত শিকার তুমি করতে পারো।

আমি যাবো তোমার সঙ্গে! ডিকের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। প্রথমটায় তো ফার্গুসনের কথা তার বিশ্বাসই হতে চাচ্ছিলো না। পরে যখন বুঝলেন বন্ধু তাকে ঠাট্টা করছেন না, বরং একটি সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কথাই প্রকাশ করছেন, তখন জোর

দিয়ে বললেন, অসম্ভব, তা হয় না। আমি তো এখনও তোমার মতো পুরোদস্তুর পাগল হয়ে যাইনি, কাজেই ও-সব আজগুবি মৎলব আমার মাথায় খুব-একটা আসে না।

ফার্গুসন কিন্তু তার সংকল্প থেকে একতিলও নড়লেন না। প্রথমটায় ডিক যতই আপত্তি করুন না কেন, ফার্গুসন যখন শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন ডিক তখন অন্যদিক দিয়ে আক্রমণ চালালেন। জেদ কারুই কম নয়, দুজনেই সমান একরোখা। ফার্গুসন তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনই আর ডিকেরও পাহাড়ের মতো অনড় প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই তিনি সঙ্গে যাবেন না। পরিকল্পনাটি জনসাধারণের কাছ থেকে যতই হাততালি বা পিঠচাপড়ানি পাক না কেন আসলে এটা কেবল অবাস্তবই নয়, রীতিমতো অসম্ভব। অন্য লোক হলে ডিক এই প্রস্তাবের ভয়াবহতা নিয়ে হয়তো আলোচনা করতেন, কিন্তু ফার্গুসনকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই : আগে যিনি প্রাণ হাতে করে বিভিন্ন সংকটের মধ্যে একা অকুতোভয়ে চলাফেরা করেছেন, তাঁকে সাধারণ লোকের মতো প্রাণের ভয় দেখানো হাস্যকর। কাজেই ডিক যুক্তি-তর্ক দিয়ে ফার্গুসনের প্রস্তাবের অবাস্তবতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুক্তি জিনিশটার উপর তো ডিকেরই কেবল একতরফা অধিকার নেই। ফার্গুসনের বৈজ্ঞানিক মনও যুক্তিকে কোনো অব্যর্থ তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতো ব্যবহার করতে জানে। ডিকের সমস্ত বিরোধিতাকেই ফাগুসন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তর্কাতর্কি চলার পর ডিক কেনেডির বিরোধিতায় একটু বিচলিত হলেন। তাছাড়া, সত্যি-বলতে, ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় শিকার করতে যাওয়ার প্রস্তাবটা তাকে ভেতরে-ভেতরে কিঞ্চিৎ দুর্বল করে দিয়েছিলো। অমন লোভনীয় প্রস্তাব কি একটুও বিবেচনা না-করে অগ্রাহ্য করে দেয়া যায়, না কি তা কখনও দেয়া উচিত? কিন্তু, তবু বেলুনে করে যাওয়ার কথাটা ডিকের কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিলো না।

বেশ-তো, যেতেই যদি হয় তাহলে হাঁটা-পথে যেতে আপত্তি কীসের? বেলুনে করে যেতে চাচ্ছো কেন? হঠাৎ তারপর বেলুন কোনোরকমে ফুটো হয়ে যাক, আর মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাই। এর কোনো মানে হয় না। অন্যকোনো দিক দিয়ে মৃত্যু এলে তবু তার সঙ্গে খানিকক্ষণ লড়াই চালানো যায়, না-যুঝে এত সহজে হার স্বীকার করার কোনো কথাই ওঠে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তো করার কিছুই নেই। অসহায়ের মতো মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তার চেয়ে স্থলপথ ঢের ভালো— অন্তত এত সহজে মৃত্যুর হাতে পড়তে হবে না। কেন-যে তুমি মাটির ওপর দিয়ে যেতে চাচ্ছো না, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

স্থলপথে মাটির ওপর দিয়ে এইজন্যে যেতে চাচ্ছি না যে, এর আগে যতবারই হাঁটাপথে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সবই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফার্গুসন বন্ধুকে বোঝতে বসে গেলেন। আফ্রিকায় যাবার চেষ্টা তো আর আজকেই প্রথম হচ্ছে না, এর আগে ইয়োরোপের অনেকেই সেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই স্থলপথ বেছে নিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন। জন্তুজানোয়ার, অসুখ-বিশুখে, আফ্রিকার দুর্দান্ত আদিবাসীদের হামলায় ও পথশ্রমে প্রত্যেককেই খামকা ক্লান্ত হতে হয়েছে। অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ-কেউ প্রায়-মৃত অবস্থায় যখন ফিরে এসেছেন, তখন কঙ্কালটা বাদে মনুষ্য-শরীরের আর-কিছুই তাদের অবশিষ্ট ছিলো না। তা ছাড়া আমাদের যাবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আফ্রিকার ঠিক কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুনো। পথেই যদি আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে গিয়ে আর লাভ কী, হয়তো ফিরে-আসার কোনো ক্ষমতাই তখন আমাদের অবশিষ্ট থাকবে না। কী করে পথের এই বিপজ্জনক ও মারাত্মক শ্রম বাদ দিয়ে আফ্রিকার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুনো যায় সে-কথা ভাবতে গিয়েই আকাশযানের

কথা আমার মনে পড়ে। বেলুনে করে যাওয়ার সুবিধে কত, তা কি আর তালিকা করে বোঝানো যায়। আকাশপথে যাবো বলেই এইসব বিপদ-আপদ আমাদের কোনো নাগালই পাবে না, তার অনেক উপর দিয়ে তার হাত এড়িয়ে আমরা চলে যাবো, তাছাড়া কত তাড়াতাড়ি যাবো, তাও একবার ভেবে দ্যাখো। আগে যে-সব অভিযানকারী যেপথ অতিক্রম করতে এক মাস লাগিয়েছিলেন, আমরা তা অনায়াসেই বেলুনে করে দু-তিন দিনে চলে যাবো, এমনকী নিরাপদেই যাবো। ভ্রমণকারীদের সামনে পথে যেসব বাধা আসে, তার কিছুই আমরা অনুভব করতে পারবো না। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাহাড়পর্বত, নদী প্রান্তর মরুভূমি, অসুখবিশুখ, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু-কোনোকিছুই আমাদের বাধা দিতে পারবে না, অক্লেশে সবকিছুর উপর দিয়ে সহজেই আমরা পাড়ি দেবো। শূন্যপথে যাবো বলে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়বে, ঝড়বৃষ্টিকেও এড়িয়ে যেতে পারবো। শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছো পায়ে-চলায় এ-সব কোনোকালেই সম্ভব হত না। বেলুনের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকবে আমারই হাতে-কখনও অনেক উঁচু দিয়ে, কখনও-বা মাটির সামান্য কিছু ওপর দিয়ে, যখন যেভাবে সুবিধে হয়, সেভাবেই আমরা যাবো।

বেলুন তোমার মর্জি-মাফিক চলবে নাকি? তার চলা তো নির্ভর করবে হাওয়ার গতিবেগের ওপর। কাজেই তোমার সুবিধে অনুযায়ী তা চলবে কী করে?

এমন কোনো-একটা প্রশ্নই আশা করেছিলেন ফার্গুসন, কাজেই প্রশ্নটা শুনে তাকে মোটেই বিচলিত দেখালো না। চট করে বললেন, তার ব্যবস্থা ও আমি ঠিক করেছি। আমরা তো পুবদিক থেকে পশ্চিমে যাবো, তুমি নিশ্চয়ই জানো বাণিজ্যবায়ুর গতিও সেই দিকেই—ওই বাণিজ্যবায়ুই আমায় গন্তব্য পথে যেতে সাহায্য করবে। একটু থেমে আবার যোগ করলেন, এতদিন ধরে বেলুনকে যখন-তখন ওপরে ওঠাবার ও নিচে নামাবার

জন্যে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু কেউই এমন-কোনো পথ বাৎলাতে পারেনি যাকে বিশেষ সুবিধেজনক বলা চলে। কিন্তু আমি অনেক ভেবেচিন্তে এমন-একটি প্রক্রিয়া বের করেছি, যার সাহায্যে অনায়াসেই যে-কোনো বেলুনকে ইচ্ছেমতো চালানো যায়। তুমি তো জানো গ্যাস যত সম্প্রসারিত হয়, ততই তা হালকা হয়ে পড়ে। বেলুনের গ্যাস সম্প্রসারিত করে আমি তাকে ওপরে ওঠাবো, আর গ্যাস সংকোচন করিয়ে তাকে নিচে নামাবো। প্রশ্ন করতে পারো, এই সংকোচন সম্প্রসারণ আমি ইচ্ছেমতো করবো কী করে? উত্তরে বলবো, অতি সহজেই। গ্যাসের উত্তাপের তারতম্যের ওপরই তার সংকাচন ও সম্প্রসারণ নির্ভর করে। তাপ বাড়িয়ে দিলেই গ্যাস ছড়িয়ে গিয়ে হালকা হবে আর তাপ কমিয়ে দিলেই তা একজায়গায় জড়ো হয়ে ভারি হয়ে যাবে।

সবই না-হয় বুঝলাম, ডিকের গলা খুব হতাশ শোনালো, কিন্তু তবু কিছুতেই আমার মন এতে সায় দিতে চাচ্ছে না, ফার্গুসন।

এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই, ডিক। তুমি যে সঙ্গে যাবে, তা আমি অনেক আগেই ঠিক করে ফেলেছি। তুমি আর আমি ছাড়া আর যাবে জো—তুমি তো জানোই, ওকে না-নিয়ে আমি কোথাও যাই না। আর জো যদি বিনা দ্বিরুক্তিতেই যেতে পারে, তাহলে তোমার যেতে এত আপত্তি কীসের, তা আমি বুঝতে পারছি না।

জো – ফার্গুসনের চিরসাথী ও বিশ্বস্ত অনুচর

জো—সে হলো ফার্গুসনের চিরসাথী ও বিশ্বস্ত অনুচর! যারাই জোকে জানে, তারাই একবাক্যে সমস্বরে এ-কথা বলে যে, তার মতো ভৃত্য আর হয় না। অনেকদিন থেকেই সে ফার্গুসনের সঙ্গে আছে, আর সে-যে কেবল অদ্ভুত বিশ্বাসী, তা-ই নয়, তার মতো প্রভুভক্তও অতি বিরল। ফার্গুসনকে সে দেবতার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। ফার্গুসনের চালচলন, কথাবার্তা–সব তার কাছে মহৎ বলে প্রতিভাত হয়। তিনি যা-ই করেন, তা-ই তার ধারণায় একমাত্র ধ্রুব সত্যি। এর আগে ফার্গুসনের সঙ্গে সবকটি অভিযানেই সে অংশ নিয়েছিলো বলে অভিযান-সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে সে যথেষ্ট ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি অর্জন করেছে : অনেকের কাছে যে-সব কাজ বিপজ্জনক ও দুঃসাধ্য বলে মনে হবে, অতি সহজে অবলীলাক্রমে জো সেগুলি করতে পারে। আর সে পারে না, এ-হেন কাজ কিছু আছে কি না সন্দেহ। কাজেই কোনো দুরূহ অভিযানে তার মতো লোকের সাহায্য ও সাহচর্যের তুলনা হয় না। ফার্গুসন তাকে মুখ ফুটে কখনোই বলেননি যে তাকে তিনি সঙ্গে নেবেন, কিন্তু তবু জো নিশ্চিতভাবেই জানে যে সে সঙ্গে যাবে। কোথায় যাবে, কেন যাওয়া হবে, কতদিনের জন্যে—এ-সব কথা তার কাছে বাহুল্য, অবান্তর ও অনাবশ্যক, এ-সব ব্যাপারে কোনোই কৌতূহল নেই তার; সে কেবল জানে, ডক্টর ফার্গুসন নতুন অভিযানে বেরুবেন, কাজেই সে যে সঙ্গে যাবে তা তো স্বতঃসিদ্ধ, এ-সম্বন্ধে আর-কোনো আবোলতাবোল কথা উঠতে পারে বলে সে মনে করে না।

জো-র চেহারাও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো—যেমন লম্বা-চওড়া তেমনি স্বাস্থ্যবান, কিন্তু গোটা শরীরে মেদের বাহুল্য নেই, অতিরিক্ত চর্বি নেই কোথাও, কেবল পেশী আর হাড়-ইস্পাতের মতো পিটিয়ে তৈরি, পাথরের মূর্তির মতো ঋজু ও দৃঢ়। শরীরের কোনো

অংশে বাহুল্য নেই বলে ক্ষিপ্রতায় সে নেকড়ের মতো। কথা খুব কম বলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টু-শব্দও উচ্চারণ করে না কিছুতেই, আর ই-হা করেই পারতপক্ষে কাজ চালিয়ে দেয়। ফার্গুসনের প্রতি তার শ্রদ্ধা অসীমে পৌঁছেছিলো বলেই ফার্গুসনের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক কোণে যেতেও তার দ্বিরুক্তি ছিলো না।

স্বভাবতই সে অতি শান্ত, তার জীবনের মূসূত্র হলো নিয়মনিষ্ঠা; কাজকর্মের ব্যাপারে সে ক্ষিপ্র, চটপটে। জীবনে যে অভাবনীয়ের কোনো স্থান আছে, তা তার মুখ দেখে কেউ কল্পনাও করবে না। যত বিস্ময়কর পরিস্থিতিতেই পড়ুক না কেন, কিছুতেই সে স্তম্ভিত হয় না। অতি দ্রুত চলে তার দক্ষ হাত আর যে-কোনো কাজেই সে পারঙ্গম; আর যেটা তার সবচেয়ে বড় গুণ তা এই : গায়ে পড়ে সে কখনও উটকো পরামর্শ দেয় না, এমনকী, যখন তার পরামর্শ চাওয়া হয়, তখনও সম্ভব হলে নির্বাক থাকে।

গত কয়েক বছর ধরে সে ফার্গুসনকে ছায়ার মতো পায়ে-পায়ে অনুসরণ করেছে। কিন্তু কোনোদিনও সে ভুলেও এমন-কোনো অভিযোগ করেনি যে পথ বড়ো লম্বা, কি পথশ্রম সহ্যের সীমা ছাড়ালো; পৃথিবীর যে-কোনো কোণের জন্যেই তাকে বাক্স-তোরঙ্গ গোছাতে হোক না কেন—তা সে তিব্বতের দুর্গমতম স্থানই তোক কি আমাজোনের সবচেয়ে মারাত্মক অঞ্চলই হোক—কোনো কথাই সে মুখ ফুটে বলে না, কোনো প্রশ্ন না-করেই প্রভুকে সে সর্বত্র অনুসরণ করে। সমস্ত রোগকেই অবলীলায় প্রতিরোধ করে তার স্বাস্থ্য; প্রত্যেকটি পেশী আঁটো আর কঠিন—কিন্তু স্নায়ু বলে তার যেন কিছুই নেই—অন্তত তার মানসের ওপর স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নেই। সেইজন্যেই তুমুলতম বিপদের মুহূর্তেও তাকে পাথরের মূর্তির মতো নির্বিকার ও অবিচল দেখায়।

ঠিক ছিলো জানজিবার থেকেই যাত্রা শুরু হবে। জানজিবার অবস্থিত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে-বিষুবরেখা থেকে প্রায় তিনশো ষাট মাইল দক্ষিণে, ভারত মহাসাগরের তীরে। জানজিবার পর্যন্ত যাওয়া হবে জাহাজে। সরকার থেকে এই উদ্দেশ্যে আটশো টনের জাহাজ রেজোলিউট নিয়োজিত করা হয়েছিলো—এই জাহাজই ফার্গুসন ও তার সঙ্গীদের নিয়ে যাবে সুদূর জানজিবার দ্বীপে; যার হাতে জাহাজ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিলো তার নাম ক্যাপ্টেন পিনেট। তার নেতৃত্বে ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ষোলো তারিখে যাত্রার জন্যে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হয়ে রেজোলিউট গ্রীনউইচে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছিলো—এখন সব প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র বোঝাই করা হবে জাহাজে, তারপর ফেব্রুযারির একুশ তারিখে সেই দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হবে।

ফার্গুসন তো একদিন অভিযানের নানা ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। এক মুহূর্তও অবসর নেই—কতরকম ব্যবস্থা করতে হবে, এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, ওঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তার সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করছেন–এক ফার্গুসন যেন অনেক হয়ে গিয়ে নিজের সব জিনিশের তদারক করতে লাগলেন।

হিশেব-নিকেশ করে আগেই তিনি দেখেছিলেন,–খাদ্য, পানীয়, নানারকম যন্ত্রপাতি কলকজা ও আনুষঙ্গিক অন্যসব জিনিশ মিলিয়ে প্রায় চার হাজার পাউণ্ড হবে, কাজেই বেলুনের মাপ ও ক্ষমতা এমন হওয়া চাই যাতে সে এই ওজন বহন করতে পারে। ওজনের হিশেবে যাতে সুক্ষ্মতম গলদও না-থাকে, এইজন্যে ফার্গুসন নিজেদের ওজন পর্যন্ত আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন। ওজনের হিশেব হলো এই রকম: ডক্টর ফাণ্ডসন স্বয়ং ১৩৫ পাউণ্ড, ডিক কেনেডি ১৫৩ পাউণ্ড আর জো-র ওজন ২২০ পাউণ্ড।

ফার্গুসনের বিচক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা মাপের দুটি বেলুন তৈরি করা হয়েছিলো, একটি বড়ো ও একটি ছোটো ছোটোটি থাকবে বড়ো বেলুনটির ভেতর। দুটি বেলুনই তৈরি করা হলো শক্ত রেশম দিয়ে, ওপরে থাকলো গাটাপার্চারের আবরণ। মজবুত একটা লোহার নোঙর আর খুব টেকশই রেশম দিয়ে পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি দড়ির মইও সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করা হলো। বড়ো বেলুনটির ওজন হললা সাড়ে-ছয়শো পাউণ্ড আর ছোটো বেলুনটির হলো পাঁচশো পাউণ্ডের কিছু বেশি। যাতে বসে যাবেন, সেই দোলনা বা কারএর ওজন হলো দুশো আশি পাউণ্ড। যন্ত্রপাতি কলকজা, তাঁবু, নোঙর, বন্দুক প্রভৃতি নানারকম আনুষঙ্গিক জিনিশপত্র দুশো পাউণ্ড। শুকনো মাংস, কফি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার-দাবার প্রায় চারশো পাউণ্ড, পানীয় জলও তাই, পোশাকপরিচ্ছদ সাতশো পাউণ্ড, হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন দুশো আশি পাউণ্ড, আর বস্তায় করে দুশো পাউণ্ড ওজনের পাথরের টুকরো (কখনও বেলুনকে ওপরে তুলতে হলে বেলুন থেকে তো ওজন কমাতে হবে, তাই এই পাথর অর্থাৎ ব্যালাস্ট)–একুনে চার হাজার পাউণ্ড।

এতসব জিনিশপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করতে গিয়ে ফার্গুসন যখন দম ফেলবার সময়টুকুও পাচ্ছেন না, ডিক কেনেডি কিন্তু তখন অত্যুৎসাহী উপসর্গদের উৎপাতে অস্থির। ঝাঁকে-ঝাঁকে লোকজন এসে প্রশ্নের পর প্রশ্নে কেনেডিকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে মারলে। উত্ত্যক্ত হবার একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে স্নায়ুগুলি পর্যন্ত বিকল হয়ে গিয়ে কোনো-কিছু বোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফ্যালে। শেষটায় কেনেডিরও তা-ই হলো। লোকজনেরা এসে হাজার জ্বলাতন করলেও শেষদিকে তিনি যেন কিছুই করতে পারতেন না। প্রথমটায় তিনি খবরকাগজগুলোর মুণ্ডপাত করতেন–যত নষ্টের গোড়া এই কাগজগুলো, সম্ভব-অসম্ভব নানা বিবরণী ছাপিয়ে এরাই একের পর এক হুজুগ তুলে লোকজনকে খেপিয়ে তোলে। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, সমস্ত পরিকল্পনা সংগোপন

রাখার জন্যে যতই সযত্ন চেষ্টা করা হোক না কেন, শেষটায় তারা কী করে যেন সব টের পেয়ে যায়। আফ্রিকার রহস্যময় অরণ্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ও আজগুবি বিবরণেরও শেষ নেই। অসংখ্য সব হাস্যকর মতামত, কয়েক লক্ষ গুজব আর আকাশস্পর্শী সব বুজরুকির খবর ছড়িয়ে গেলো। তারা যেন অদৃশ্য থেকেও সর্বত্র তাদের অসহ্য অস্তিত্বের ঘোষণা করতে লাগলো। শেষটায় প্রায় পাগলই হয়ে গেলেন কেনেডি, কবে একুশে ফেব্রুয়ারি আসে, কবে জাহাজ ছাড়ে, দিনরাত কেবল সে-কথাই ভাবতে লাগলেন।

বেলুন দুটি, কার, নোঙর, দড়ি, জলের পিপে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব আনুষঙ্গিক জিনিশ সবই অবশেষে একদিন জাহাজে তোলা হলো, ফার্গুসন আর কেনেডির জন্যে দুটি ক্যাবিন ভালো করে সাজানো-গোছানো হলো, জো-র জন্যেও উপর্যুক্ত ব্যবস্থা করা হলো। আর এরই মধ্যে একদিন রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে সোসাইটির মস্ত সভাঘরে ফার্গুসনদের বিরাট একটি ভোজে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে শুভেচ্ছা জানালে। সেখানে বিভিন্ন বক্তা তাদের যাত্রার সাফল্য কামনা করার পর অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে ফার্গুসন সবিনয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি যখন নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়লো তখন জাহাজঘাটায় লোকে লোকারণ্য। রেজোলিউট নোঙর তুলে নড়ে উঠতেই অসংখ্য লোক সম্মিলিত গলায় অভিযাত্রীদের নামে জয়ধ্বনি দিলে আর সেই প্রবল ধ্বনির মধ্য দিয়ে জাহাজ তার গন্তব্যপথের দিকে স্থির গতিতে এগিয়ে চললো।

রেজোলিউট বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো

রেজোলিউট বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো, তবু পথও তো অনেক লম্বা, কাজেই দিনের পর দিন ফার্গুসন তাঁর সহযাত্রীদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে বেলুনের সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। একদিন তিনি সকলকে তার যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ভালো করে বুঝিয়ে বললেন :

একদিন এই রহস্যময় মহাদেশ আদি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিলো লোভনীয় এক সভ্যতার গৌরব। প্রাচীন মিশর—ছেলেবেলা থেকে কত গল্পই না শুনেছি তার—কত তার রহস্য, আর কী বিপুল ঐশ্বর্য! সাত হাজার বছর আগেকার মানুষদের সেইসব ঐশ্বর্য একবার নিজের চোখে দেখে আসতে পারবো না, তাও কি হয়। অথচ যেমহাদেশ এই সভ্যতার আশ্রয়, কত সামান্যই আমরা জানি তার, কত কম; বলতে গেলে কিছুই না। কিন্তু কোনোদিনও তা জানবো না, তা কী করে হয়? কাজেই আফ্রিকা যাবার পরিকল্পনা আমার মাথায় অ্যাদ্দিন ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

কী শুনেছি আমরা মিশর সম্বন্ধে? না, মিশর হলো অতীতের জাদুঘর; সেই জাদুঘর চোখে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। মনে হবে, আজকের পৃথিবী থেকে হঠাৎ যেন ছিটকে সেই পাঁচ-সাত হাজার বছরের পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে-যাওয়া গেছে। আর কী তার ঐশ্বর্য-চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দেয়। সোনা-রুপো হিরে-মুক্তোর যেন ছড়াছড়ি, কত শৌখিনতা, কী অপরূপ শিল্প-আজকের এই উনিশ শতকের তথাকথিত অগ্রসর মানুষও বুঝি তা কল্পনাতেই আনতে পারে না। অথচ এ-সব জিনিশ পাওয়া গেছে কোথায়-না, রাজারাজড়াদের কবরে। অবাক করে দিতে পারে এই প্রশ্ন : কবরের ভেতরেই এত

জিনিশ! কিন্তু ঠিক তাই। কেননা তারা মনে করত, মরার পরই মানুষের সব শেষ হয়ে যায় না, কবরের মধ্যেও মানুষ থেকে যায়। আর কবরের ভেতরে এভাবে থাকার সময় রাজাদের যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকুও অভাব না-হয়, সেইজন্যেই থরে থরে সাজিয়ে রাখা হতো এত-সব রকমারি জিনিশ। আশবাবপত্র, অলংকার, শৌখিন শুমার খাপ, বাজনার যন্ত্র, খাবার-দাবার, বাসন-কোশন—এমনকী দাসদাসী ধোপা নাপিতের দল পর্যন্ত। কবরের ভেতর পাথরের তৈরি সারি-সারি পুতুল পাওয়া গেছে-আসলে তা তো আর পুতুল নয়, কবরের মধ্যে পাওয়া দাসদাসীর দল। তারা ভাবতো, এই প্রস্তরীভূত মূর্তিগুলোই কবরের ভেতর সেবার কাজ চালাতে পারবে। গোটা জিনিশটা ভাবতেও অবাক লাগে—এত-সব জিনিশ কিনা কোনোদিন জীবিতের ভোগে লাগেনি। যে-ধনরত্ন সমস্ত কল্পনাকেও হার মানায় তা কিনা সব মৃত্যুর অপেক্ষায় গুছিয়ে রাখা! মরার আয়োজন নিয়ে এমন মত্ত হয়ে উঠেছিলো যে আদি সভ্যতা–তার জন্যে কি তাকে কোনো দাম দিতে হয়নি?

হয়েছিলো; সেই দাম যে কী ভীষণ, তার প্রমাণও আছে—ঐ কবরের ভেতরই। কবরে তাদের ছবি আর মূর্তি পাওয়া গেছে-রাজার জন্যে তারা বয়ে নিয়ে চলেছে কী বিপুল বিলাস-সামগ্রী, তার ভারে নুয়ে পড়েছে পিঠ, ধনুকের মতো বেঁকে গেছে শিরদাঁড়া, হাড় আর চামড়া ছাড়া শরীরে সামান্যতম মাংস নেই। পরনে ছিড়ে-যাওয়া নেংটি, আর পিঠের কাছে নিষ্ঠুর প্রহরীর উদ্যত চাবুক।

এই ঐশ্বর্যের সম্ভার যারা গড়ে তুলেছিলো, তারা প্রাণ দিয়ে মৃতের জন্যে সব আয়োজন করে গেলো! যে-পিরামিড আজকের পৃথিবীর সরচেয়ে বড়ো-একটি আশ্চর্য, তাও মৃতের জন্যে তৈরি। জীর্ণ পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে, একলাখ লোক বিশ বছর ধরে অক্লান্ত

ও একটানা পরিশ্রম করে গড়েছিলো এই পিরামিড। তার চৌকো ভিতের একদিকের মাপ হলো লম্বায় সাতশো পঞ্চান্ন ফুট, মাটি থেকে তার চুড়োটা প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পিরামিড। যেদিন শুন্যে তার চুড়ো অসীম স্পর্ধায় মাথা তুলে দিলে সেদিন হিশেব করে দেখা গেছে এ-পিরামিড় গাঁথতে লেগেছে ২,৩০০,০০ পাথরের চাই, গড়পড়তায় তার একেকটার ওজন প্রায় সত্তর মণ। সব পাথর তো আর সমান নয়—কোনোটা ছোটো কোনোটা বড়ো, আর বড় পাথরের মধ্যে একটি আছে যার ওজন প্রায় দশ হাজার মণ, তার দিকে তাকালেই নাকি মাথা ঘুরে যায়।

পাথরগুলো আনা হয়েছিলো মরুভূমি পেরিয়ে নীলনদের ওপারের অনেক দূরের একটি পাহাড় থেকে। অতদূর থেকে এমন-সব মস্ত পাথরের টুকরো কী করে নীল নদ পার করে মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে এতদূর নিয়ে আসা হয়েছিলো ভাবতে গেলে কোনো থই পাওয়া যায় না! গোটা ব্যাপারটাই এমনি অতিকায় যে প্রায় অলৌকিক বলে মনে হতে চায়। আর তাও কি আজকের কথা?

এই অতিকায় ব্যাপারটি গড়ে তুলেছে কিনা পাঁচ হাজার বছর আগেকার দুর্ধর্ষ মানুষ! ঐশ্বর্যের সকল সম্ভারের কথা যদি ছেড়েও দেয়া যায়, তাহলেও এই একটি জিনিশ যারা নির্মাণ করেছিলো, তাদের ক্ষমতা কী বিপুল ছিলো, সে-কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অথচ আজকের পৃথিবীতে—এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের বাসিন্দা হয়েও আমরা কতটুকু জানি আফ্রিকার কথা, এই বোধই চিরকাল আমার মগজে জ্বালা ধরিয়েছে।

যতবারই আমি ভ্রমণে বেরিয়েছি সবসময়েই এই অসম্পূর্ণতার চিন্তা আমাকে মগ্ন করে রেখেছে। তাই শেষকালে এই প্রচেষ্টার জন্যে আমি তৎপর হয়েছি। যে-উৎস থেকে একদিন স্রোত এসেছিলো নীলনদের, আদি পৃথিবীকে যা দিয়েছিলো সভ্যতার গরীয়ান দীপ্তি, সেই এতকালের অনাবিষ্কৃত উৎসস্থল আবিষ্কারের জন্যেই তাই এই অভিযানে বেরিয়েছি আমি আজ। জানি, আমার পিছনে আছে সারা জগতের শুভেচ্ছা আর ঈশ্বরের দয়া, তাই অভিযান যে সফল হবেই, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই আর নেই।

আবহাওয়া পরিষ্কার, বাতাস অনুকূল, সমুদ্রও শান্ত

বেশ দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হচ্ছিলো রেজোলিউট। আবহাওয়া পরিষ্কার, বাতাস অনুকুল, সমুদ্রও শান্ত। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে মোজাম্বিক উপসাগর নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে অবশেষে পনোররাই এপ্রিল জাহাজ এসে পৌঁছুলো জানজিবার বন্দরে।

জানজিবারের ইংরেজ রাজদূত রেজোলিউটেরই প্রতীক্ষ করছিলেন, নোঙর ফেলতেই তিনি সদলবলে জাহাজে এসে উঠলেন। অত্যন্ত উৎসাহ দেখালেন তিনি। ফার্গুসনের পরিকল্পনায়, সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জাহাজ থেকে জেটি পর্যন্ত মাঝখানে যে একটুকরো কালো সমুদ্র রয়েছে, সেটুকু পেরিয়ে রাজদূত বা কন্সলের সঙ্গে ফাগুসন তার সঙ্গীদের নিয়ে বন্দরে চলে এলেন।

বেলুনদুটিকে যখন তীরে নামানো হবে, এমন সময় গোল বাধলো। অনেক অনুসন্ধানের পর কন্সাল ব্যাপারটি সহজেই বুঝে নিলেন। ফার্গুসন প্রথমটা গণ্ডগোলের কারণ বুঝতে পারেননি, কন্সালই সবিস্তারে তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন, বেলুন তীরে নামাতে গেলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হবে, কেননা এখানকার আদিবাসীরা তাতে ভয়ানকভাবে বাধা দেবে। তাদের ধারণা হলো, এই-যে বিধর্মী লোকগুলো বেলুন নিয়ে আকাশে উড়তে এসেছে, এটা হলো তাদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ-কাফেরদের এই স্পর্ধা তারা কিছুতেই সহ্য করবে না, হাতিয়ার নিয়ে বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সূর্য আর চাঁদের উপাসক এরা। আর এই দুজন দেবতা থাকেন আকাশে, খ্রিষ্টানরা বেলুন নিয়ে আকাশে উঠে দেবতার আবাস অপবিত্র করে দিতে চাচ্ছে-এমন অলুক্ষুণে কাণ্ড যদি ঘটতে দেখা

যায়, তাহলে তাদের বিষম অমঙ্গল হবে। এই আশঙ্কাতেই তারা ভীষণভাবে খেপে গিয়েছে।

তাহলে এখন কী করবো? ফার্গুসন একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। দ্বীপের যেখানেই বেলুন নামাতে যাই না কেন, সেখানেও তো ঐ একই বিপদ বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে আসবে। কাজেই সে-চেষ্টা করে তো কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, ওদের কি কোনোরকমে বোঝাতে পারা যায় না যে আমরা দেবতার আবাসকে অপবিত্র করতে চাচ্ছি না—আমরা অন্য কারণে আকাশে উড়তে চাচ্ছি?

না, তা ওরা বুঝবে না। কোনো যুক্তি যদি থাকতো, তাহলে হয়তো বোঝানো যেতো। কিন্তু লোকে যেখানে হাজার বছরের জড় বিশ্বাস আঁকড়ে বসে আছে, সেখানে যত জোরালো যুক্তিই দিন না কেন, তা মোটেই কাজে আসবে না, সবই নিস্ফল হবে। তবে একটা কাজ হয়তো করা যায়। চিন্তিত স্বরে কন্সাল বললেন, অনেকক্ষণ ধরে এ-বিষয়ে আমি ভেবেছি। ঐ-যে সমুদ্রের মাঝখানে কালোর মাঝে সবুজ ফুটকির মতো ছোটো-ছোটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, তারই কোনো-একটায় গিয়ে বেলুন নামান। চারদিকে জাহজের নাবিকেরা কড়া পাহারা দেবে, আমিও কিছু লোক দেবো। সবাই যদি হুঁশিয়ার থাকে, তাহলে সম্ভবত আর কোনো ভয় থাকবে না।

কন্সালকে ধন্যবাদ জানালেন ফার্গুসন। তা-ই ভালো। খামকা কোনো ঝামেলায়–গিয়ে আমরা যাতে নির্বিঘ্নে আমাদের কাজ সারতে পারি, সেটাই আমাদের সর্বাগ্রে দেখা উচিত।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ হলো। শামুকের মতো গুটিগুটি ঐরকম একটি দ্বীপের গায়েই রেজোলিউটকে ভেড়ানো হলো। চারদিকে বহুদিনের পুরোনো সব মস্ত গাছ ছায়া আর আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা জায়গায় বেলুনদুটিকে নামিয়ে দেয়া হলো। আশি ফিট উঁচু মস্ত দুটি মাস্তুল—একটা শক্ত লোহার তার জুড়ে দিয়ে তারই ওপর দড়ির সাহায্যে বড়ো বেলুনকে টেনে খাড়া করিয়ে তার তলায় ছোটো বেলুনটিকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো; এই দুটো বেলুনের মধ্যে আবার যোগাযোগের ব্যবস্থা। আছে, সংযুক্ত করা হয়েছে শক্ত একটি লোহার নল, যার ভেতর দিয়ে বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাস যাবে। এখন গ্যাস তৈরি করে তা দিয়ে বেলুনকে ভর্তি করতে হবে।

গ্যাস তৈরি করার জন্যে ফার্গুসন অনেকরকম যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলি লাগসইভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গ্যাস বানানোর কল তৈরি করা হলো। গ্যাস বানানোর জন্য চাই সালফিউরিক অ্যাসিড, পুরোনো লোহার টুকরো, জল। সমস্ত ঠিকঠাক করতেই সারা দিন চলে গেলো। ফার্গুসন ঠিক করলেন, গ্যাস তৈরির কাজ শুরু হবে পরের দিন সকালে।

ঘুম যখন ভেঙে গেলো সূর্য উঠতে তখনও ঢের দেরি। রাতটা জাহাজেই কাটিয়েছিলেন ফার্গুসন। তার বিছানার কোল ঘেঁসেই গোল জানলা, জাহাজের ভাষায় তাকে বলে পোর্টহোল। পর্দা সরিয়ে তিনি বাইরে তাকালেন। কালো জলের একটুকরো মাঝখানটায় আর তার পরেই সবুজ দ্বীপ—এদিকে-ওদিকে তখনও অনেক আলোর ছিটে ছড়ানো রয়েছে। দ্বীপের তখনও ঘুম ভাঙেনি, যেন ঝিমুচ্ছে। ঘুম-চোখে শেষরাতের দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আলসেমি করার অবসর সত্যিই ছিলো না। এক্ষুনি তৈরি হতে হবে। বিছানার চাদর থেকে নিজেকে বার করে জামা-জুতোর মধ্যে শরীর গলিয়ে দিয়ে জাহাজের এ-

গলি ও-গলি ঘুরে খাবার ঘরে এসে হাজির হলেন ফার্গুসন। সেখানে এর মধ্যেই কেনেডি আর জো এসে কফির টেবিলে হাজির, ক্যাপ্টেনও সঙ্গে আছেন; তাদেরও চোখ থেকে ঘুমের ছাপ মোছেনি, তবু চোখগুলো যেন চকচক করছে। কড়া কালো কফি নিয়ে বসলেন সবাই। প্রাতরাশ সারতে-না-সারতে অন্যরাও খাবার ঘরে এসে হাজির হলো। নিজেদের দায়িত্বের কথা মনে করে সকলেই শেষরাতে উঠে পড়েছে।

কাজ আরম্ভ হলো সকাল আটটায়। গ্যাস তৈরি হয়ে ধীরে-ধীরে বেলুনের ভেতর প্রবেশ করলো, আর ক্রমশ বেলুনের আকার বদলে যেতে লাগলো। প্রথমটায় তার আকার হলো গোল বৃত্তের মতো, তারপর তার তলার দিকটা সরু হয়ে পেটমোটা হয়ে গেলো—ওপর দিকটাও ঈষৎ চেপে এলো। যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সেইজন্যে প্রথমে কয়েকটা বস্তা নামিয়ে দেয়া হলো কার-এর মধ্যে, তারপর একে-একে সব জিনিশপত্র ভোলা হতে লাগলো। নোঙর, দড়ি, যন্ত্রপাতি, খাবার-দাবার, জলের পিপে, তাবু—সব তোলা হলো একের পর এক।

সব ব্যবস্থা করতে-করতেই বেলা পড়ে এলো। রোদের কড়া আঁচ কমে এলো, পশ্চিমদিককার গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে গেলো উষ্ণ জঙ্গলের প্রবল সূর্য, কেবল রশ্মিজ্বলা দিগন্ত থেকে শেষ আলোর কয়েকটি রঙিন রেখা বাঁকাভাবে এসে পড়লো বেলুনের গায়ে।

কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো চারদিকে, নৌকোয় করে লোকলস্কর লাগিয়ে নজর রাখা হয়েছিলো উপসাগরের দিকেও। পাছে এ-দেশের আদি বাসিন্দারা দল বেঁধে আক্রমণ করে বসে, তাই এই খবরদারি।

মূল দ্বীপ জানজিবারে অবশ্য তারা নানা ধরনের হাতিয়ার নিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করে দুর্বোধ্য ভাষায় তর্জন-গর্জন শুরু করে দিয়েছিলো। তাদেরই মধ্যে কয়েকজন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলো, সেই অত্যুৎসাহীরা সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে ছোটো দ্বীপটায় সাঁৎরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নাবিকদের হাতে বাধা পেয়ে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলো। সারারাত ধরে সমুদ্রের তীরে সেইসব কালো মানুষদের রাগি শোরগোল আর হুমকি শোনা গেলো।

সন্ধেবেলায় রেজোলিউট জাহাজে অভিযাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিলো। পরদিন সকালবেলায় বেলুন তার যাত্রাপথে রওনা হবে—সকলেই সেইজন্যে উত্তেজনায় ভেতরে-ভেতরে একধরনের চাপা অস্থিরতা বোধ করছিলেন। কেবল জো ছিলো স্থির ও নির্বিকার।

রাত থাকতেই সবাই ছোটো দ্বীপটায় চলে এলো। পূবদিক থেকে হাওয়া আসছে, সগর্বে আকাশে দুলছে বেলুন! ক্যাপ্টেন তার নাবিকদের নিয়ে বিদায় জানাতে এসেছিলেন, মূল দ্বীপ থেকে কন্সাল এসেছিলেন সদলে যাত্রার প্রাথমিক কাজ শেষ করে অভিযাত্রীরা সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

কেনেডি আর জো যখন ডক্টর ফার্গুসনের সঙ্গে ঝোলানো কার-এ গিয়ে উঠে বসলেন, তখন বেলা ন-টা। যে-নাবিকেরা দড়ি ধরে ছিলো তারা আস্তে-আস্তে হাতের মুঠো আলগা করে দড়ি ঢিলে করে দিলে, ধীরে-ধীরে আকাশের দিকে প্রায় কুড়ি ফিট উঁচুতে উড়ে গেলো বেলুনটি। ওপর থেকে ডক্টর ফার্গুসন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এই আকাশযানের

একটি নাম দেয়া কর্তব্য আমাদের। ভিক্টরিয়া নামটাই আমার কাছে সবচেয়ে সংগত বলে মনে হচ্ছে।

নিচে থেকে সমস্বরে সকলে উল্লসিত কণ্ঠে রানী ভিক্টরিয়ার দীর্ঘ জীবন কামনা করে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

তারপর হঠাৎ প্রবল হাওয়া এলো, থরথর করে কেঁপে উঠলো বেলুন। ফার্গুসন বললেন, আর দেরি নয়, এবার রওনা হওয়া যাক। বিদায় জানালেন তিনি সকলকে।

সঙ্গে-সঙ্গে হাতের দড়ি ছেড়ে দিলে নাবিকেরা, হাওয়ার দমকা বেলুনটির ঝুঁটি ধরে একবার চর্কির মতো পাক খাইয়ে দিলে, তারপরেই দ্রুতবেগে বেলুন আকাশে উঠে গেলো। যাত্রীদের চোখে নিচের সবকিছু আচমকা একেবারে ছোটো হয়ে গেলো, সব যেন পুতুলের মতো, সব খুদে মাপের, কেবল জাহাজের উঁচু মাস্তুলে ব্রিটিশ পতাকা পংপং করে উড়ছে হাওয়ায়।

রেজোলিউট জাহাজের মস্ত চারটে কামান বিকটভাবে গর্জন করে উঠলো। তোপ দেগে অভিনন্দন জানানো হলো অভিযাত্রীদের।

পরক্ষণেই রেজোলিউটের মাস্তুলের পতাকাটি অভিযাত্রীদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলো। শেষ যখন তাকে দেখা গিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো একটি খেলনাজাহাজ যেন কালো জলের ওপর পড়ে আছে। জানজিবার দ্বীপটির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত উদঘাটিত হয়েছিলো একটি পুতুলের শহরের মতো, কালো মাটির ওপর কতগুলি রেখা আর বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার মতো মাঠ-ঘাঠ-পথ, পিঁপড়ের সারির মতো মানুষজন।

আস্তে-আস্তে তা যখন মিলিয়ে গেলো, নিচে দেখা গেলো কালো সমুদ্রকেতার অস্থির, চঞ্চল, ফেনিল জল স্থির একটা বিশাল ছবির মতো পড়ে থাকলে যেন তলায়।

নীল আকাশে তুলোর পাঁজার মতো শাদা মেঘ

নীল আকাশে কেবল তুলোর পাঁজার মতো শাদা মেঘ, তাদের গা থেকে রোদ আর আলো যেন চুঁইয়ে পড়ছে। সূর্য পূর্বদিকে অনেকখানি উঠে এসেছে, আর অনুকূল হাওয়ার গায়ে লেগে আছে তারই উষ্ণ স্পর্শ। ভিক্টরিয়া এক দমকে শূন্যে প্রায় দেড় হাজার ফিট উঠে এসে নিমেষের মধ্যে তাদের চোখের সামনে ভীষণ-সুন্দর আফ্রিকাকে উন্মোচিত করে দিয়েছিলো।

প্রথমে কথা বলে উঠেছিলো জো, কী চমৎকার দেখাচ্ছে! এই-প্রথম বোধহয় জীবনে সে নিজের থেকে কথা বললে, আর তার মধ্যে এই প্রথম তার বিস্ময়ের স্পর্শ পাওয়া গেলো। ফার্গুসন তার কথা শুনে স্মিতভাবে একটু তাকালেন কেবল, তারপর ব্যারোমিটারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নানারকম নোট নিতে লাগলেন। কেনেডি কথাও বললেন না, অন্য-কোনো দিকে তাকালেনও না-মুগ্ধ চোখে অপলকে সব দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে, ঘণ্টায় আট মাইল গতিতে, আফ্রিকার মূল উপকূলে এসে উপস্থিত হলো ভিক্টরিয়া। বেলুনটিকে খুব নিচে দিয়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলেন ফার্গুসন, কেননা তাতে ভালো করে সব দেখা যাবে। বিশেষভাবে নির্মিত চুল্লির আগুন তাই একটু কমিয়ে দিলেন তিনি। বেলুনের ভেতরকার গ্যাস ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এলো; আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেলুনটি ক্রমে-ক্রমে দেড় হাজার ফিট থেকে নেমে এলো। প্রায় তিনশো ফিট উচ্চতায় এলে পর ফার্গুসন আর তাপ কমালেন না : আপাতত এই উচ্চতা দিয়েই যাক।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের উজারামো নামক স্থানের ওপর দিয়ে বেলুন চলে গেলো এক মিশকালো গভীর বনের দিকে–সমুদ্রর ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে, দূরে দিগন্তের কাছে উঁচু পাহাড়ের কালো চুড়োগুলি দেখা যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে বন পেছনে ফেলে একটি গ্রামের উপর চলে এলো ভিক্টরিয়া। মানচিত্র দেখে বোঝা গেলো এই গ্রামের নাম কিজোটু।

গ্রামের লোকেরা বেলুনটাকে দেখতে পেয়েছিলো। বাঁশপাতার ছোটো-ছোটো ঘর থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এলো তারা, আকাশের দিকে আবাক চোখ-মুখ তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় সমস্বরে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলো যে তার খানিকটা রেশ বেলুনেও এসে পৌঁছুলো। ভয়ে, আতঙ্কে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করলে তারা প্রথমে, তারপরে সন্ত্রাসের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই লোকগুলো রেগে উঠলো, তীরধনুক নিয়ে এসে অজস্র তীর ছুঁড়লো বেলুন লক্ষ্য করে, আকাশের দিকে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হলো, তাদের বিষের তীর মোটেই বেলুনের কাছে পৌঁছুলোই না, অবলীলাক্রমেই সেই তীক্ষ্ণ তীরগুলির অনেক ওপর দিয়ে বেলুন ভেসে গেলো। তারপর ক্রমে-ক্রমে সেই গ্রামটিও পেছনে পড়ে রইলো, ক্রমে দিগন্তের কালো বন যেন তার রাক্ষুসে বিবরে গ্রামটিকে লুকিয়ে ফেললে।

এতক্ষণে ডিক কথা বললেন, সত্যি কী অদ্ভুত আমাদের এই আকাশযান! এর কাছে গাড়ি-ঘোড়া, জাহাজ-রেল কিছুই লাগে না, আর-কোনো যানবাহন থেকেই এক নিমেষে চারদিক এমনভাবে দেখে নিতে পারা যায় না। অপূর্ব! আগাগোড়া ব্যাপারটাই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

কেবল তা-ই নয়, ফাসন যোগ করে দিলেন, নিজের চোখেই তো দেখলে, ডাঙার কোনো বিপদ-আপদই শূন্যে এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। এখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো, কেন আমি বেলুনে করে যাবার পরিকল্পনা করেছিলুম। যদি তোমার কথা শুনে স্থলপথে যেতুম তাহলে কত সময় যেতো আর কত হাজার রকম ঝামেলা পোহাতে হতো, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো?

আমি তখন এতটা বুঝতে পারিনি, ডিক বললেন, তার জন্যে আমার খুব-একটা দোষ নেই। এর আগে কে আর ভাবতে পেরেছিলো যে মানুষ একদিন আকাশ জয় করে নেবে যেমনভাবে জয় করেছে জলকে। জলের জাহাজের মতো তৈরি হবে শূন্যের জাহাজও!

ফার্গুসন কেবল একটু হাসলেন।

জো জিগেস করলে, এখন কি নাস্তার ব্যবস্থা করবো? জলযোগের উদ্যোগ?

তাই-তো, জো বলাতেই জঠর জানান দিচ্ছে যে বেশ খিদে পেয়েছে। কেনেডি বলে উঠলেন : তাহলে আর দেরি কোরো না, চটপট তোমার ব্যবস্থা করে ফ্যালো, জো।

না-না, দেরি কেন হবে? বিস্কুট তো আছেই, টিন থেকে একটু শুকনো মাংস বের করে নিলেই হবে। তাছাড়া কফিও সঙ্গে প্রচুর আছে। বানাতেও কোনো অসুবিধে হবে না। ওই চুল্লিটা থেকে যত-খুশি জল গরম করে নিতে পারা যাবে। আলাদা করে আগুন জ্বালাবার কোনো দরকার নেই, তাতে বরং খামকা বিপদ ডেকে আনা হবে।

ফার্গুসন এত নির্দেশ না-দিলেও পারতেন জো-কে। সে চক্ষের পলকে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সবাই নিচে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ঘন সবুজ গাছ আর স্নিগ্ধ শস্যের খেত। এই সবুজের ভেতর প্রাণের আয়োজন কী বিপুল-প্রচুর যেন উদ্দাম সবুজের বন্যা! এমন উর্বর জমি আর-কোথায় পাওয়া যাবে? প্রকৃতি যেন মানুষের হাতে ফসলের রাশি তুলে দেবার জন্যে উশখুশ করছে, এতটুকু চেষ্টাতেই যে-কেউ ওখানে সোনা ফলাতে পারবে। এই শস্যশ্যামল কালো মাটির গায়ে কোথাও তামাক গাছের সারি, কোথাও-বা ভারতীয় শস্য, বার্লি, ধান গাছের প্রাচুর্য, অজস্র কলা, খেজুর ও নারকেল প্রভৃতি নানা গাছ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো পাহাড়, কোনোখানে আবার এমনসব গাছের সারি, যাদের কাউকেই তারা চেনেন না।

দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ওই গাছগুলোর নাম কী? কী মস্ত ঐ গাছগুলো, দেখেছো? এর গোটাকয়েকেই তো এমন-এক বিশাল বন তৈরি হয়ে যাবে, যেখানে সূর্যের আলো পর্যন্ত ভেতরে পৌঁছুতে পারবে না। কী নাম এগুলোর, জানো?

এ-গাছের নাম বাওবাব, ফার্গুসন উত্তর দিলেন, এখানকার ভাষায় এর অন্যএকটা নাম আছে। এ-দেশের আদি বাসিন্দারা একে বলে বাঁদুরে রুটি গাছ। ওই দ্যাখো আরেকটা কী মস্ত গাছ-ওটা প্রায় একশো ফিট মোটা হবে।

আফ্রিকার পুবদিকে ভারত সাগরের মধ্যে মোম্বাসা হচ্ছে একটি ছোটো দ্বীপ, তার বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় হাজার চল্লিশ। হাতির দাঁত, চামড়া আর রবারের ব্যাবসার জন্যে

এই দ্বীপে অনেক লোক আনাগোনা করে। বহুদিন থেকেই দ্বীপটি ইতিহাসবিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৯০ সালে বিখ্যাত নাবিক ভারত-আবিষ্কারক ভাশকু-ডা-গামা এখানে এসেছিলেন। সেই সময় একজন আরব সর্দার তাকে জাহাজগুদু ডুবিয়ে মারার চক্রান্ত করেছিলো। দৈব সহায় ছিলো বলে কোনো গতিকে এই চক্রান্তের কথা আগেই জেনে গিয়েছিলেন ভাকু-ডা-গামা, আর জেনেই মহা খাপ্পা হয়ে মোসাকে তিনি তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখানকার সুলতান অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাকে ঠাণ্ডা করেন। মোম্বাসার প্রধান রাজপথ ভাকু-ডা-গামা স্ট্রিট আজও এই অবিস্মরণীয় নাবিকের স্মৃতি বহন করছে। মোম্বাসা শহর প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় হাজার বছর আগে, কিন্তু শহরটি যে তার চেয়েও ঢের পুরোনো, তা এখানে-আবিষ্কৃত প্রাচীন চিন, মিশর ও পারস্য দেশের অনেক জিনিশ দেখে বোঝা যায়। ১৫০৫ থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল পর্তুগিশদের অধীনে—এই নিয়ে আরবদের সঙ্গে পূর্তুগিশদের অনেকবার লড়াইও হয়ে গিয়েছে। ১৬৯৬ সালের মার্চ মাস থেকে সুদীর্ঘ সোয়া তিন বছর ধরে পর্তুগিশরা আরবদের দ্বারা এই দ্বীপে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে; পুর্তুগাল থেকে সাহায্য পাবার আশায় অবরুদ্ধ পুর্তুগিশরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা সফল হয়নি। দুর্ধর্ষ আরবদের তলোয়ারের মুখে পর্তুগিশদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ যায়; কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর ঠাট্টা যে কত নিদারুণ হতে পারে তাই প্রমাণ দেবার জন্যে, সেই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু-দিন পরেই পুর্তুগাল থেকে সাহায্য এসে উপস্থিত হয়। কিছুদিন পরে মোম্বাসা আবার পুর্তুগিশদের হাতে গেলেও তাদের সেই প্রাধান্য স্থায়ী হতে পারেনি। মোসা এখন জানজিবারের সুলতানের অধীনে। আফ্রিকার বিপুল অভ্যন্তরে কত-যে গভীর জঙ্গল, দুর্গম গিরিমালা ও বিজন মরুভূমি লুকিয়ে আছে মোম্বাসাকে দেখলে তা কিছুই মনে হয় না।

সম্ভব হলে জানজিবার থেকে মোম্বাসা হয়েই যেতেন অভিযাত্রীরা! কিন্তু জানজিবার থেকে বেলুন হাওয়ার তাড়নে আফ্রিকার উপকূলে গিয়ে পৌঁছুলো-হাওয়ার গতি ছিলো উত্তর-পশ্চিম দিকে। বোঝা গেলো বেলুন মোম্বাসার ঠিক ওপর দিয়ে যাবে না বটে, তবে তার কিছু দূর দিয়ে তাকে অতিক্রম করেই ভিক্টরিয়া হ্রদের ধার ঘেঁসে নীলনদের দিকে চলে যাবে।

বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল বলে এখানকার দিন আর রাতের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি। দিনের বেলা বেশ গরম, সকালে-সন্ধেয় থাকে আরামদায়ক উষ্ণতা, আর রাতে ঠাণ্ডা পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উঁচু এলাকায় উচ্চতার জন্যে উত্তাপ কিছু কম থাকে–কিন্তু যত উত্তরে যাওয়া যায় গরমের প্রবলতা ততই বেশি। এ-দেশের বেশির ভাগ জায়গার জলবায়ুই হচ্ছে চরম প্রকৃতির—অনেকটা মরা ধুলোর মরুভূমির মতো—তেমনি উগ্র আর পরস্পর-বিরোধী আবহাওয়া।

যে-সব জায়গায় বৃষ্টিপাত তুলনায় বেশি, সেখানেই বনভূমি দুর্গম।সেই বনে আছে রুপোলি ইউক্যালিপটাস, কপূর, দেবদারু আর বাঁশের ঝাড়। কোনোখানে আবার সিডার গাছের দীর্ঘ বন। মরুভূমির স্পর্শলাগা অঞ্চলে রয়েছে নানা রঙের গুল্ম আর চারাগাছের ঝোপ। কোনো-কোনো এলাকায় কফি আর চায়ের চাষ হয়।

সন্ধে সাড়ে ছটায় ভিক্টরিয়া ডাথুমি নামক পর্বতের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলো। এই পর্বত অতিক্রম করার জন্যে আরো তিনশো ফিট উঁচুতে তুলতে হবে বেলুনকে, ফার্গুসন সেইজন্যে তার চুল্লির তাপ আঠারো ডিগ্রি বাড়িয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে ওপরে উঠে গেলো বেলুন, অনায়াসেই ডিঙিয়ে গেলো সেই উঁচু পর্বত।

ওপরে যত তাড়াতাড়ি ওঠা যায়, নিচে নামতে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগে। নামতে-নামতে একসময় কার থেকে নোঙর নামিয়ে দেয়া হলো। একটি বিরাট বাওবাব গাছের ডালে সেটি ভালোভাবে জড়িয়ে যেতেই বেলুন থেমে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে দড়ির মই নামিয়ে দিয়ে জো নিজে নেমে এসে নোঙরটাকে ভালো করে ডালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিলে, তারপর সেই রেশমি মই বেয়ে আবার কার-এ উঠে এলো। বেলুন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো, পুবদিকে পাহাড়ের আড়াল থাকায় হাওয়ার চাপ লাগলো না তার গায়ে, আর তাই থেমে গেলো তার কাঁপুনিও।

রাতের মতো বিশ্রাম এখানে।

হিংস্র বনভূমির কালো রাত, ঠাণ্ডাও বেশ পড়েছে। কত-রকম অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে, তার ঠিক নেই। কাজেই সাবধানে থাকার জন্যে ঠিক করা হলো পালা করে তিনজনে সারারাত পাহারা দেবেন। ফার্গুসন দেবেন নটা থেকে বারোটা, কেনেডি বারোটা থেকে তিনটে, আর জো বাকি সময়টুকু—সকাল ছ-টা পর্যন্ত।

রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করে কেনেডি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, জো-ও তাই করলে; কেবল ফার্গুসন অতন্দ্র পাহারায় জেগে বসে থাকলেন।

রাত কেটে গেলো নিরাপদেই

রাত কেটে গেলো নিরাপদেই, কিন্তু পরদিন—সেদিন শনিবার—কেনেডি উঠলেন বিষম জ্বর নিয়ে। প্রথমটায় ফাণ্ডসন ভেবেছিলেন, বুঝি-বা উষ্ণ জঙ্গলের জ্বর আক্রমণ করেছে তাকে, কিন্তু একটু পরেই যখন বুঝতে পারলেন যে জ্বর ততটা গুরুতর নয়, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওষুধের ব্যবস্থা করে কেনেডিকে যখন চাঙা করে তোলা হলো, তখন কিন্তু অস্বস্তি এলো নতুন দিক দিয়ে।

সূর্য ওঠবার খানিকক্ষণ পরেই আকাশের সকল কোণে কে যেন মিশকালো এক চাদর বিছিয়ে দিলে; প্রথমটায় ছিলো আলকাতার মতো কালো একটুকরো মেঘ, দেখতে-না-দেখতে তা সারা আকাশে ছড়িয়ে গেলো আর অন্ধকার করে এলো চারদিক। ঘন-ঘন চমকালো বিদ্যুৎ যেন আলোর এক-একটি আঁকাবাঁকা তীব্র সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে মেঘকে; বিদ্যুৎ-দিয়ে-চেরা মেঘখানি ক্রমেই এমনভাবে এগিয়ে এলো যে মনে হলো বিরাট এক কালো রঙের ড্রাগন তার আগুনের দাঁত বার করে সারা আকাশকে কামড়ে, ছিড়ে, চিবিয়ে গিলে ফেলতে চাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ মেঘে মেঘে চাপা পড়ে গেলো, বাজ ফাটলো গুরুগুরু আর বাজের সেই গড়ানে আওয়াজ শুনে যেই ঝড়ের ঘুম ভাঙলো, অমনি বনের যত গাছপালা পাগল হয়ে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে।

দীর্ঘ একটি তীব্র আলোর রেখা তারপর জেগে উঠলো, কোনো মস্ত গাছের মতো ধীরে-ধীরে তা গজিয়ে উঠলো যেন আকাশে, আর আগুনের ডালপালা কেঁপে এঁকেবেঁকে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে শুরু করে দিলে। মনে হলো তারা যেন কোনো অশরীরীর অদৃশ্য দেহের আগুনজ্বালা শিরা-উপশিরা। মেঘের রং যে এত কালো হতে পারে, আর বিদ্যুতের তীব্র

তলোয়ার যে এত ক্ষিপ্র হতে পারে, আর এমন ভীষণ-গম্ভীর আওয়াজ করে যে আলো ফেটে পড়তে পারে ফার্গুসনরা কেউই তা আগে জানতেন না। কিন্তু এই ভয়ানক সুষমা উপভোগ করার সময় তখন ছিলো না। তক্ষুনি যদি নোঙর খুলে বেলুনকে আকাশে ওড়ানো না-যায়, তাহলে যে-কোনো মুহূর্তে বেলুনের ক্ষতি হতে পারে।

ফার্গুসনের নির্দেশে সেই বিষম ঝড়ের মধ্যেই নোঙর তুলে যাত্রা শুরু করে দেয়া হলো। প্রায় ছ-শো ফিট উঠে আসার পর পাওয়া গেলো প্রয়োজনীয় অনুকূল বাতাস, নিচে তখন রাগি ঝড় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। উত্তর-পশ্চিমমুখো বাতাস বইছে, বেলুন তার পথ ধরে শূন্যে অগ্রসর হলো।

এবারে আমরা যার সম্মুখীন হচ্ছি, ফাণ্ডসন জানালেন, তার নাম রুবি-হো পর্বত–এ-দেশের লোকেরা তার নাম দিয়েছে হাওয়ার পথ। ঐ পাহাড়ের চুড়ো উঠে গেছে। শূন্যে, কাজেই সেটা পেরুতে হলে আমাদের অনেক উচ্চতায় ওঠবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার কাছে যে-মানচিত্র রয়েছে, তাতে যদি তথ্যসংক্রান্ত কোনো গলদ নাথাকে, তাহলে এখন প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উঠতে হবে আমাদের; কাজেই সেই অনুযায়ী চুল্লির আগুনকে আবো গনগনে করে তুলতে হবে।

চুল্লির লাল ঘুলঘুলির ভেতর গিয়ে দেখা গেলো, ভেতরের স্বচ্ছ অগ্নিশিখা আরোস্বচ্ছ হয়ে এলো ক্রমশ, উত্তাপ বেড়ে চললো প্রবল হারে, আর তার ফলে হালকা হয়ে ছড়িয়ে গেলো গ্যাস, বেলুন ফুলে উঠলো আগের চেয়ে অনেক বেশি, আর তরতর করে উঠতে লাগলো ওপর দিকে। হাওয়ার জোরালো টানে অচিরেই সেই তুষার-ঢাকা পাহাড়ের তীক্ষ্ণ শ্বেত চুড়ো পেরিয়ে গেলো ভিক্টরিয়া, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই রুবিহো-র অন্য

দিকে উশাগারা প্রদেশের মাটিতে এসে নামানো হলো বেলুন। কাছেই কালো একটি বন দেখা যাচ্ছে। যদি সেখানে কোনো শিকার মেলে, তবে তা-ই দিয়েই রাতের খাবার চালানো যাবে। কেননা অকারণে সঙ্গের খাবার তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার কোনো মানে হয় না; তাছাড়া ক্রমাগত বাসি খাবার গলাধঃকরণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ, সেদিক দিয়ে টাটকা মাংসের চেয়ে উপকারী খাবার আর কী আছে।

ফার্গুসন তার পরিকল্পনার কথা কেনেডিকে খুলে বললেন। তুমি বরং জো-কে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ো–যদি দু-একটা হরিণ শিকার করতে পারো, তাহলে তোফা নৈশভোজের ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া তোমারও বন্দুকের হাত যাতে খারাপ না-হয়, সেজন্যও মাঝে-মাঝে শিকারের ব্যবস্থা করে চর্চার সাহায্যে তাকে শানিয়ে নেয়াও দরকার। আফ্রিকায় এসে যদি শিকারই না-করলে তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসার সার্থকতা কী রইলো?

আর দেরি করলেন না কেনেডি, তক্ষুনি জো-কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু দূরেই সেই কালো গভীর বন : মস্ত বাওবাব, রুপোলি ইউক্যালিপটাস আর হলদে পোডোকাপাস ছাড়া গাম নামক একজাতীয় গাছ সেখানে আছে, ঝোপঝাড়ও অসংখ্য। খুব সাবধানে হুঁশিয়ারভাবে কেনেডি জো-কে নিয়ে এগুতে লাগলেন। ভীষণ বন! ভালো করে ভেতরে ঢুকতে-না ঢুকতেই কাটাঝোঁপের তীক্ষ্ণ আক্রমণে কেনেডি আর জো-র পোশাক ছিঁড়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। এমন অসময়ে এই দুর্গম বনে মানুষকে ঢুকতে দেখে বানর আর পাখির দল অবাক হয়ে আরো জোরে কলরব করে উঠলো।

গাছের ফাঁকে একটু ফাঁকা-মতো জায়গা; হলদে-কালোয় ডোরাকাটা একদল জিব্রা ছুটোছুটি করছিলো, হঠাৎ বেবুনদের তীব্র শোরগোল শুনে চমকে তারা দৌড় দিয়ে বনের দূর কিনারে উধাও হয়ে গেলো। কয়েকটা বেঢপ জিরাফ তাদের অদ্ভুত গলা বাড়িয়ে গাছের আগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিলো, জিব্রাদের তীব্র গতি দেখে তারাও ছুটে পালাতে শুরু করে দিলে। এই জিরাফদের ছুটে পালাবার ভঙ্গি এমন কিম্ভুত আর বেয়াড়া যে কেনেডি তা দেখে না-হেসে থাকতে পারলেন না।

হঠাৎ ঠোঁটের ডগায় আঙুল তুলে ডিক কেনেডি শ্-শ্-শ্ বলে আওয়াজ করে উঠে জো-কে কোনো আওয়াজ না-করতে ইশারা করলেন। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো ছোটো-একটি জলস্রোত কালো মাটির ওপর আঁকাবাঁকা রুপোলি রেখা এঁকে ছলছল করে বয়ে চলেছে, আর সেখানে কতগুলি ছোটো-বড়ো হরিণ জল পান করছে।

নিঃশব্দে বন্দুক উঁচিয়ে ডিক গাছের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন। তারপরেই প্রবল আওয়াজ করে আগুন ফেটে পড়লো, তীব্র দ্রুত নীল একটি শিখা ক্ষীণ রেখা একে হরিণদের দিকে ছুটে গেলো। চক্ষের পলকে হরিণেরা সবাই উধাও হয়ে গেলো : ক্রাস, চমক, আতঙ্ক—সব তাদের মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় করে তুলেছিলো, কিন্তু বন্দুকের ঘোড়ায় আবার চাপ দেবার আগেই একটি হৃতপ্রাণ হরিণ ছাড়া সেই জলস্রোতের আশপাশে আর-কেউ রইলো না। হরিণটির কাঁধে গুলি বিঁধেছে, মাটিতে পড়ে চারপা শূন্যে তুলে একটু ছটফট করে সে নিঃসাড় হয়ে গেলো।

প্রশংসাভরা গলায় জো বলে উঠলো, চমৎকার গুলি করেছেন; অদ্ভুত টিপ-অব্যর্থ।

হরিণটির দিকে এগিয়ে গেলেন ডিক। তারপর যখন জো তার চামড়া ছাড়িয়ে কিছু মাংস কাটতে ব্যস্ত, এমন সময় অনেক দূর থেকে একটি বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এলো। চটপট কিছু মাংস কেটে নিলে জো, তারপর দু-জনেই তাড়াহুড়ো করে বেলুনের দিকে ফেরবার জন্যে দৌড় শুরু করে দিলেন, আর এমন সময় আবার আরেকটি গুলির শব্দ দু-জনের কানে এসে পৌঁছুলো।

আরো তাড়াতাড়ি! ছুটতে-ছুটতে বলে উঠলেন ডিক, নিশ্চয়ই ফার্গুসনের কোনো বিপদ হয়েছে!

একটুক্ষণের মধ্যেই কালো বনের জটিলতা ছাড়িয়ে এলেন ডিক, জো এলো তার পেছন-পেছন; আর বন ছাড়িয়ে এসেই দু-জনের চোখে পড়লো বেলুনটি, ডিক দেখলেন ফার্গুসন কারএর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

সর্বনাশ হয়েছে। সেদিকে তাকিয়েই আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো জো।

কী হয়েছে? কী? রুদ্ধশ্বাসে জিগেস করলেন ডিক।

মস্ত একদল কালো মানুষ–কাফ্রি বলে তো ওদের, তা-ই না?–আমাদের বেলুন ঘিরে ফেলেছে।

বনের সীমান্ত থেকে বেলুনটি প্রায় মাইল-দুয়েক দূরে। দূর থেকে দেখা গেলো খুদে-খুদে একদল কাফ্রি চারদিক থেকে বেলুনটিকে ঘিরে ফেলেছে। যে-গাছে ভিক্টরিয়াকে নোঙর

করা হয়েছিল, সে-গাছেও কয়েকজন লোক উঠে পড়েছে। মগডালেও দেখা যাচ্ছে কালো-কালো ফুটকির মতো কয়েকজনকে।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন ডিক। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখার মতো এক মুহূর্তও সময় নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাইল-খানেক পথ ছুটে পেরিয়ে এলো দু-জনে, আর এমন সময় আবার চারদিক কাঁপিয়ে ফার্গুসনের হাতে বন্দুক গর্জন করে উঠলো। গুলির আওয়াজ শুনে ডিক তাকিয়ে দেখলেন গাছের মগডাল থেকে কালো একটি মানুষ ডাল থেকে ডালে ঘুরে-ঘুরে. নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। মাটি থেকে যখন সে প্রায় কুড়ি ফিট উঁচুতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো একটা ডাল ধরে সে ঝুলে পড়লো, আর তার পা দুটি শূন্যে ঝুলতে লাগলো।

হঠাৎ জো সশব্দে হেসে উঠলো। আরে দেখুন, দেখুন, মিস্টার কেনেডি, ওটা ল্যাজ দিয়ে ডালটা জড়িয়ে ধরে ঝুলছে! এ-যে দেখছি কালো মত একটা বাঁদর। আরে, তা-ই তো-ভারি অবাক কাণ্ড তো। সবগুলোই তো বাঁদর! ছি-ছি, আমরা কিনা তাদের কাফ্রি বলে ভুল করে বসেছিলুম।

আসলে ওগুলো ছিলো একপাল কুকুরমুখো বাঁদর যাদের বেবুন বলা হয়। ভীষণ হিংস্র স্বভাব-এরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কেবল যে ভয়ই দেখায় তাই নয়, বাঁদুরে বুদ্ধির উৎকট ব্যবহারে অনেক সময় মানুষকে একেবারে নাজেহাল করে তোলে। দেখতে এত বিকট যে দস্তুরমতো ভয় করে। শেষকালে অবশ্য আরো কয়েকটি গুলি খেয়ে ঐ বেবুন-বাহিনী দাঁত-মুখ খিচিয়ে বিশ্রী আওয়াজ করতে-করতে পালিয়ে গেলো আর স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে পেছনে কয়েকজন মৃত সঙ্গীকে রেখে গেলো তারা।

আর তার পরক্ষণেই জো-র সঙ্গে-সঙ্গে কেনেডিও ভিক্টরিয়ার কাছে এসে পৌঁছুলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবার নোঙর তুলে দেয়া হলো। আকাশে উঠে এসে অনুকুল বাতাস পেলে ভিক্টরিয়া, যথারীতি ভেসে চললো পশ্চিম দিকে। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে, প্রায় চারটে বাজে।

সন্ধে সাতটার সময় ভিক্টরিয়া কায়মি নদীর উপত্যকা পেরিয়ে এলো। সেই উপত্যকার পরেই মাইল-দশেক জুড়ে সমতল ভূমি : বেশ কতগুলো গ্রাম বাওবাব আর অন্যান্য গাছের ফাঁকে লুকিয়ে আছে। নোংরা এক-একটি গ্রাম, তাদের কুঁড়েঘরগুলি যেমন নড়বোড়ে তেমনি ভাঙাচোরা, বাসিন্দারাও তেমনি গরিব ও শ্রীহীন। ওরই মধ্যে একটা বাড়ির জৌলুশ আর জাঁকজমক আছে, উগোগোর সুলতান সেটায় থাকেন। অন্য অনেক অঞ্চলের চেয়ে এরা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য, প্রাণপণে নিজেদের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করছে।

কানেয়েসি উপত্যকা অতিক্রম করতেই সমতলভূমি শেষ হয়ে আবার শুরু হলো উঁচু-নিচু পাহাড়ি জায়গা। বেলুন কখনও চলেছে বনের ওপর দিয়ে, কখনও তার তলায় দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের কালো চূড়ো, কখনও-বা রেশমি শাদা সুতোর মতো আঁকাবাঁকা জলধারা, কখনও-বা কেবল ধূ-ধূ করা দিগন্তজোড়া মাঠ।সেই পাহাড়ি এলাকা শেষ হতেই আবার দেখা গেলো মাইল-মাইল জুড়ে পড়ে আছে সবুজ মাঠ, শ্যামলতায় ছাওয়া। ধীরে-ধীরে সন্ধে গাঢ় হয়ে রাত করে এলো। সে-রাত্রে আর বেলুন থামিয়ে কোথাও রাত্রিবাস করার চেষ্টা করলেন না ফার্গুসন, বেলুন একটানা উড়েই চললো।

প্রবল এক বাতাসের বেগ

প্রবল এক বাতাসের বেগে উত্তর-পূর্ব কোণের এক পাথুরে প্রদেশের উপর দিয়ে যখন ভিক্টরিয়া পরদিন সকালে উড়ে চলছিলো, তখন ফার্গুসনের ঘুম ভাঙলো। রাতে যখন তার ঘুম আসে তখন বেলুন যাচ্ছিলো এক বনের ওপর দিয়ে। তারপর ঘুমের ভিতর কখন যে এই নতুন এলাকার ওপর বেলুন চলে এসেছে, তা আর তিনি টের পাননি। চারদিকেই উঁচু-নিচু লাল পাথরের বন্ধুর সমারোহ-অনেকটা কবরখানার সমাধিফলকের মতো দেখতে। চোখা, থ্যাবড়া, তিনকোণা, পাঁচকোণা—নানা আকারের পাথর, দিনের বেলার স্বচ্ছ রোদ তাদের ওপর ঝলমলে আলো ফেলেছে।

এখন তারা কাজে থেকে একশো মাইল দূরে। কাজে আফ্রিকার একটি নামকরা প্রদেশ। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল দূরে তার অবস্থান, কিন্তু তবু তা ব্যাবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগমস্থলে তার উপস্থিতি বলে উটের বহর নিয়ে সদাগরেরা আসে নানা দিক থেকে বিবিধ পণ্যসম্ভার নিয়ে হাতির দাঁতের জিনিশ, তুলো, পোশাক-আশাক, কাচের মালা, এ-সব তো বটেই, তার ওপরে এখানে আবার ক্রীতদাসও বেচা-কেনা হয়।

বেলা দুটো নাগাদ বেলুন কাজে পৌঁছুলো। ফার্গুসন বললেন, সেদিন সকাল ন-টায় সময় আমরা জানজিবার ছেড়ে রওনা হয়েছি, আর দু-দিন পরেই আজ কি না পাঁচশো মাইল দূরে কাজে তে এসে উপস্থিত হয়েছি! দেখেছো, বেলুনের আশ্চর্য ক্ষমতা! .

সীমানা-ঘেরা কতগুলি ছাউনির সমষ্টি, মাঝে-মাঝে বাঁশপাতা আর মাটির তৈরি অনেক কুঁড়েঘর। এখানকার আদি বাসিন্দারা আর ক্রীতদাসেরা এ-সব ছাউনি আর কুঁড়েঘরে থাকে; ছাউনির সামনে উঠোনের মতো একেক টুকরো জায়গা, তাতে নানা জাতের ফসল ফলে আছে।, একদিকে বাজার-কেনাবেচার বেসাতি, লোকজনের হৈ-চৈ আর শোরগোলে সরগরম। অনেক লোক বাজারে, তারা আবার নানা জাতের; সবাই যেন একসঙ্গে কথা বলছে, তাই এই চাচামেচি একেবারে অবোধ্য। ঢাক আর বাঁশির অদ্ভুত আওয়াজ, খচ্চরের ডাক, গাধার বিকট চীৎকার মেয়েগলার রিনরিনে আওয়াজ, শিশুদের কোলাহল–এইসব তো আছেই, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে উটের বহরের সর্দারের তর্জন-গর্জন, আর এই মিশ্র শব্দের প্রবলতায় জায়গাটা যেন জাহান্নামের কোনো মেলার মতো হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে এই ভীষণ শোরগোল স্তব্ধ হয়ে গেলো। অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। বিশাল ভিক্টরিয়া মন্থর গতিতে তাদের দিকে ভেসে আসছে দেখে বাজারের সেই লোজনেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। কিন্তু বেলুনটি যখন তারপর সোজাসুজি মাটির দিকে নেমে আসতে লাগলো, তখন নিমেষের মধ্যে সেখনকার আবালবৃদ্ধবনিতা, মরুভূমির সদাগর, আরব, ও নিগ্রো ক্রীতদাস—সবাই আতঙ্কে ভয়ে মুহ্যমান হয়ে আশপাশের কুটিরগুলোর ভিতর গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

কেনেডি বলে উঠলেন, কিন্তু, ফার্গুসন, ওরা সকলেই যদি এভাবে ভয় পায়, তাহলে ওদের কাছ থেকে জিনিশপত্র কেনাকাটা করবো কী করে?

ও কিছু নয়, ফার্গুসন উত্তর দিলেন, ওদের এই ভয় নেহাৎই সাময়িক। সংস্কার খুব প্রবল বটে, কিন্তু কৌতূহলের ক্ষমতা তার চেয়ে ঢের বেশি—ঐ কৌতূহলই ওদের আবার ঘর থেকে বের করে আনবে। তবে আমাদের কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে, খুব হুঁশিয়ার, একটুও অসতর্ক থাকলে চলবে না। খুব সাবধানে এগুতে হবে ওদের কাছে, কেননা তীরধনুক অথবা বন্দুকের গুলির হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। ঐ দুটি পদার্থের কাছে আমাদের বেলুন কিন্তু বড় অসহায়।

তুমি কি এদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও নাকি?

তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু আলাপ করলেই বা কী দোষ? দেখাই যাক না।

ভিক্টরিয়া আস্তে-আস্তে নিচের দিকে নেমে এসে বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটি গাছের মাথায় নোঙর ফেললো।

আস্তে-আস্তে সেই ভয়-পেয়ে-লুকিয়ে-থাকা জনতার হারানো সাহস বোধহয় ফিরে এলো; একে-একে তারা বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। সারা শরীরে বিদঘুটে উল্কিআঁকা শঙ্খের মালা পরা ওয়াগোগো জাতের কিছু লোক প্রথমে এগিয়ে এলো—এরা সব হলো ডাইনি-পুরুৎ! নারী, শিশু ও অন্য-সবাই এলো তাদের পেছনে-পেছনে। প্রবলভাবে বেজে উঠলো ঢাক আর শিঙা, আর তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বারবার প্রচণ্ড করতালি দিতে শুরু করে দিলে-মাঝে-মাঝে হাত বাড়িয়ে দিলে শূন্যের দিকে।

ফার্গুসন বললে, ওদের ধরন-ধারণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা আসলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে—এ-সবই ওদের প্রার্থনার ভঙ্গি। আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, তাহলে এবার আমাদের বোধহয় কিছুটা অভিনয় করতে হবে।

এমন সময় সেই ডাইনি-পুরুতেরা পিছন দিকে হাত তুলে কী যেন ইশারা করলে, অমনি সব চ্যাঁচামেচি যেন জাদুবলে স্তব্ধ হয়ে গেলো। পুরুদের মধ্য থেকে দু-জন এগিয়ে এলো বেলুনের আবো-কাছে, তারপর উত্তেজিতভাবে এক অজ্ঞাত দুর্বোধ্য ভাষায় ফার্গুসনদের তড়বড় করে কী যেন বলে গেলো। বুঝতে না-পেরে ফার্গুসন আরবি ভাষায় কোনোরকমে কিছু বলতেই তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্য থেকে সেই ভাষায় উত্তর এলো।

আরবি ভাষায় একটানা অনেক কিছু বললে লোকটি। তার বক্তব্য শুনে মোটামুটি ফার্গুসন বুঝতে পারলেন যে এখানকার লোকেরা ভিক্টরিয়াকে চাঁদ বলে ভেবেছে–আর তারা চাঁদেরই উপাসনা করে, ফলে চাঁদ স্বয়ং যেহেতু তার তিন পুত্রকে নিয়ে করুণাবশত তাদের এই উষ্ণ দেশকে দর্শন দিয়ে ধন্য করতে এসেছেন, এই পুণ্য দিবসের কথা তাই পুরুষানুক্রমে তারা সবাইকে গেয়ে শোনাবে। তারপর সে সম্ভ্রমে প্রায় আভূমি নত হয়ে সশ্রদ্ধ মিনতি জানালে যে, চাঁদের এই তিন পুত্র যদি অসীম কৃপায় তাদের মাটিতে পদধূলি দেন, তাদের সুলতান নাকি আবার কয়েক বছর ধরে এক মরণাপন্ন অসুখে ভুগে-ভুগে প্রায় মুমূর্ষ হয়ে আছেন–যদি দর্শন দিয়ে তাকে নিরাময় করে যান, তাহলে তারা চিরবাধিত হয়ে ধন্য বোধ করবে।

লোকটির সব কথার সারমর্ম সঙ্গীদের ইংরেজিতে তর্জমা করে জানালেন ফার্গুসন।

এই কাফ্রি সুলতানের কাছে সত্যি যাবে নাকি তুমি? অবাক গলায় শুধোলেন। ডিক।

নিশ্চয়ই। ফার্গুসন বললেন, লোকগুলোকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তাছাড়া আবহাওয়াও এখন বেশ শান্ত, কাজেই ভিক্টরিয়ার জন্যে আমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?

এই ডাইনি-পুরুৎগুলোর হাত থেকে সুলতানকে বাঁচাতে চাচ্ছি আমি। সঙ্গে ওষুধের বাক্স নিয়ে যাচ্ছি। ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি বলেই তো সুলতানের অসুখ সারছে না—যদি ঠিক-ঠিক ওষুধ পড়ে, লাগসই দাওয়াই, তাহলেই তো সব অসুখ সেরে যাবে।

ডাইনি-পুরুতরা

ডাইনি-পুরতরাই সম্ভবত আদি পৃথিবীর পরম্পরাগত জীবন্ত নিদর্শন। সারা গায়ে জন্তুজানোয়ার, ফুল, লতাপাতা, গাছপালার উল্কি আঁকা, গলায় শাঁখের মালা, মাথায় পশুললামের টুপি, কানে মস্ত হাড়ের মাকড়ি—এই হলো ডাইনি-পুরুতের চেহারা। প্রত্যেকটা দলের মধ্যে এদের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি। রাজারা পর্যন্ত এদের ভয় পায়, এদের হুকুম নিঃশব্দে তামিল করে। পুরুতদের নামকরণের রীতিটা বড়ো অদ্ভুত : বেশির ভাগেরই নাম কোনো-না-কোনো জন্তুর নামে, অবশ্য ফুলের নাম বা গাছের নামও বাদ যায় না। কেননা পুরুতের নাম হরিণ, কারুবা নাম ভালুক, কেউ আবার নিজের পরিচয় দেয় দাঁড়কাক বলে, আবার কারু-বা নাম সূর্যমুখী। ব্যাপরটা বেশ-একটু রহস্যে ভরা। নাম দিতে চাচ্ছে মানুষের দলের পুরুতের, অথচ নামটা নিচ্ছে জন্তু-জানোয়ারদের কাছ থেকে। এ-আবার কোন ধরনের ব্যাপার?

ব্যাপারটার রহস্য পরিষ্কার হয়, যদি কয়েকটি মূল সূত্রের দিকে নজর রাখা যায়। লক্ষ করলে দেখা যায়, তাদের গায়ে যে-সব উল্কি থাকে, বা যে-সব নাম তারা নেয়, তার বেশির ভাগই হলো খাবার জিনিশ। পশুপাখি, গাছগাছড়াই বেশি—আর এগুলো খেয়ে পেট ভরানো সম্ভব। অবশ্য এমন কিছু-কিছু নাম আছে যা কিনা খাবার জিনিশ নয়, যেমন বৃষ্টি, পাথর ও ঐ জাতীয় কিছু। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এগুলো আদি ও অকৃত্রিম নয়, অনেক পরের ব্যাপার, আদি যুগের অখাদ্য নকল বা অনুকরণ মাত্র। কাজেই এই সূত্র থেকে সন্দেহ হয় যে, আদি মানুষের খাবার জোগানোর সঙ্গে এই নামগুলির কোনো যোগাযোগ ছিলো—নামের ফর্দ দেখে সেই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু তা ছাড়াও আরেকটি খুব জরুরি সূত্র আছে। প্রতিটি দলের মধ্যে একটা উৎসব

আছে, যেটা সবচেয়ে জরুরি ও বড়ো; সেই উৎসবের সময় পুরো দলটা এক জায়গায় জমায়েং হয়—কিন্তু যেখানে-সেখানে নয়, আর যখন-খুশি তখনও নয়। জড়ো হবার জায়গাটা বাঁধা-ধরা, সময়টাও তাই। যেমন, কোনো দলের পুরুতের নাম যদি কাছিম হয়, তাহলে উৎসবের জন্য গোটা দল জমায়েৎ হবে কাছিমদের ঘাঁটিতে, আর কাছিমেরা যে-সময়টায় বাচ্চা পাড়ে, সেই সময়টায়। প্রশ্ন ওঠে, কেন ওরা জড়ো হচ্ছে, মৎলবটা কী ওদের। উত্তর হলো, ওরা জমা হচ্ছে কাছিম ধরার জন্যে; কাছিম ধরে খাবে, খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এমন-এক আদিম যুগে যখন আদি মানুষেরা খাবারের সন্ধানে হন্যের মতো সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র তখন এতই বাজে যে তা দিয়ে হরেক রকম খাবার জোগাড় করার কথাই ওঠে না। বন-জঙ্গলের যে-এলাকায় ওরা হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেই অঞ্চলে কেবলমাত্র যে-খাবার সহজে পাওয়া যায় তা-ই খেয়েই তাদের প্রাণ বাঁচে; তাই যারা আশপাশে কাছিম জোগাড় করতে পারে কেবল কাছিম খেয়েই তাদের প্রাণ বাঁচাতে হয়। কাছিম ছাড়া তাই ওরা নিজেদের কথা মোটেই ভাবতে পারে না; কাছিমই এদের দলের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক, কাছিমের সঙ্গেই ওদের যত আত্মীয় সম্বন্ধ, কাছিম থেকেই ওদের প্রাণ, ওরা আর কাছিম তাই মোটেই আলাদা নয়। তারপরে কিন্তু সেই আদি মানুষের অস্ত্রশস্ত্র উন্নত হলো আর তাই তারা কেবল একরকমেরই খাবার নয়, নানারকম খাবার জোগাড় করতে পারলে। তা ছাড়া দলের মানুষ বেড়েছে, বাড়তে বাড়তে অনেকগুলি দলে ভাগ হয়ে গেছে–কিন্তু তাহলেও এক দলের সঙ্গে অন্য দলের একটি গভীর সম্বন্ধ থেকে গেছে—সেটি সহযোগিতার। অর্থাৎ বাঁচার ব্যাপারে এ-দল ও-দলের সাহায্যে আসে, ও-দল এ-দলের। কীভাবে? না, ঠিক হলো, এই দল ঐ দলের খাবরে ভাগ বসাবে না, ওই দল তাই যেন এই দলের খাবারে ভাগ না-বসায়। যেমন—আগে যাদের সঙ্গে কাছিমের আত্মীয়তা ছিলো, তারা

বললে, আমরা আর কাছিম খাবো না—এ খাবার অন্য দলের খাবার হোক। আবার হরিণ-দলের লোক বললে, আমরা আর হরিণ খাবো না, এ-খাবার অন্য দল নিয়ে নিক। অর্থাৎ যে-সহযোগিতার সূত্র তাদের আটকে রাখলো তার মধ্যে কতগুলো নিয়ম হলো, কাছিম-দলের পক্ষে কাছিম খাওয়া নিষিদ্ধ, হরিণ-দলের পক্ষে হরিণ। এই সূত্র মনে রাখলেই, কেন প্রাচীন মিশরের দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তিতে জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ থেকে গেছে, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এখানেই হলো সবচেয়ে জরুরি বিষয়, যাকে বলা যায় কুহক, জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল। এই ইন্দ্রজালের প্রয়োগকতা হলো ডাইনি-পুরুৎ। ডাইনি কেন? না, তারা জাদু জানে। জাদু আর-কিছু নয়, প্রকৃতিকে জয় করার ব্যাপারে অনেক পেছিয়ে ছিলো আদিম মানুষ, তাই তারা সেই জয়ের অভিনয় করে কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় করে নেবার চেষ্টা করলে—এক ধরনের ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন আর-কি! যেমন—আকাশে জল নেই, মরুভূমি এগিয়ে আসছে তার মরা ধুলোর তুমুল ঝড় তুলে, অসুবিধে হচ্ছে চাষবাসের, তাই আকাশে জল চাই। কেমন করে তা করা যায়? না, বৃষ্টির নকল করো—সবাই মিলে একসঙ্গে তালে-তালে নাচো। দল বেঁধে একসঙ্গে যে কাজ করবে, প্রকৃতি তা মানতে বাধ্য। যদি দল বেঁধে শিকারিও নাচ নাচে আর তার মূল কথাটা যদি এই হয় যে, মনের মতো শিকার জুটেছে বলে ফুর্তির কোনো শেষ নেই, তাহলে শিকার জুটবেই জুটবে। অর্থাৎ পৃথিবীকে সত্যকার জয় করার অভাবটা কল্পনায় জয় করা দিয়ে পূরণ করে নেয়া—এটাই হলো ইন্দ্রজালের প্রথম এবং আদি সূত্র। মানুষের হাতিয়ার যতদিন নেহাৎই বাজে আর অকেজো ধরনের ততদিন অব্দি পৃথিবীকে সত্যি-সত্যি আর কতটুকুই বা জয় করা যায়? তাই আসল জয়ের অভাবটা এইভাবে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিতে না-পারলে তখন যেন প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতো না। আর ইন্দ্রজালে অধিকার ছিলো

বলেই ডাইনি-পুরুংদের হাতে চলে এলো সব প্রভাব প্রতিপত্তি। নানারকম জিনিশ তারা জমাতো-তার ভিতর হিরে-জহরৎ, নানা রঙের চকচকে পাথর, সোনারুপোও ছিলো। এ-সব জিনিশ তারা জমাতে তাদের অলৌকিক জাদু-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে। তারা ভাবতো এ-সবের ভেতর ইন্দ্রজালের শক্তি লুকোনো আছে, তাই এসব সংগ্রহ করে নিজের কাছে যে রাখতে পারবে তার অলৌকিক শক্তি আশ্চর্যভাবে বেড়ে যাবে। এ-সব তাদের কাছে বিলাসের উপকরণ ছিলো না। তারা ভাবতো, চকচকে দামি পাথরের ভেতর লুকিয়ে আছে জাদুর ক্ষমতা, তাই সে-পাথর যে ধারণ করবে —গলায় ঝোলোবে কি হাতে তাবিজ করে বেঁধে রাখবে— তার মধ্যে ঐ পাথর থেকেই অলৌকিক শক্তি চলে আসবে। আর এইসবের সঙ্গে তারা ভারিক্কি চাল আনতো নানা গুরুগম্ভীর গুমগুমে আওয়াজ-তোলা অর্থহীন আবোল-তাবোল মন্তর আউড়ে এই একটানা সুরময় ধ্বনির মধ্যে তারা যেন হুকুম করছে প্রকৃতিকে। আর যেহেতু লোকের জাদুবিশ্বাস প্রবল ছিলো সেহেতু নানা কাকতালের ফলে তারা ভাবতো প্রকৃতি বুঝি পুরুদের হুকুম তামিল করছে আর তাই শেষকালে তাদের ক্ষমতা প্রচণ্ড বেড়ে গেলো, লোকে জুজুর মতো ভয় করতে লাগলো তাকে, তাকে মানতে লাগলো মাথা নুইয়ে, কারণ সে যেমন ভালো করতে পারে, তেমনি সব জড় পদার্থের ওপর তার মন্তরের জোর খাটাতে পারে বলে সে মন্দও করতে পারে লোকের! তাই কেউ পারতপক্ষে তার বিরাগভাজন হতে চাইতো না— এমনকী দলের রাজা পর্যন্ত না। যদি ধুলোপড়া ছিটিয়ে দেয় কি অন্ধকারকে হুকুম দেয়, তাহলেই তো রাজার দফারফা, সব খেল খতম, সব ক্ষমতাই উধাও।

এই পুরুতেরা যদি একবার কোনো কারণে ফার্গুসনের উপর চটে যায় তো তাঁদের আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। তাই ফার্গুসনের সংকল্পের কথা শুনে ভিক ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। যদি একবার পুরুতেরা বুঝে ফ্যালে যে তারা চাঁদ

থেকে আসেননি, তাদেরই মতো পৃথিবীর মানুষ, তাহলে তাদের ঠকাবার জন্যে তারা মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে। ডিক তাই ফার্গুসনকে বাধা দেবার জন্য কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু ডিক কোনো কথা বলে ওঠবার আগেই ভাঙা-ভাঙা আরবিতে ফাগুসন জনতাকে জানালেন : তোমাদের কোনো ভয় নেই। চাঁদের দেবতা তোমাদের ওপর তুষ্ট হয়ে তোমাদের রাজাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাই কোনো ভয় কোরো না— আমি সুলতানকে দেখতে যাবো।

এ-কথা শুনেই ডাইনি-পুরুতেরা গুমগুমে গলায় উল্লাস জানালে, আর জনতাও তার সঙ্গে তাদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস যোগ করে দিলে।

ডিকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ফার্গুসন

ডিকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ফার্গুসন। শোনো কেনেডি, চুল্লিটার তাপ বড়িয়ে রেখে যে-কোনো সময় উড়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থেকো-নোঙরটা অবশ্য খুব আঁটো করে জড়ানো আছে, তবু চটপট উড়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। জো নিচে মাটিতে বেলুনের তলায় বসে অপেক্ষা করবে। কেবল আমি একাই যাবো সুলতানের কাছে।

আমি যাবো আপনার সঙ্গে, জো বিনীত অথচ দৃঢ় গলায় জানালে।

না, আমি একাই যাবো। উত্তর দিলেন ফার্গুসন, কোনো ভয় নেই। সত্যিই আমাদের চাঁদের ছেলে বলে ভেবেছে ওরা, কাজেই ওদের কুসংস্কারই আমার সহায় হবে। তবে, যে-কোনো বিপদের জন্যেই তৈরি হয়ে থেকো। গিয়েই চটপট চলে আসবো আমি।

দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হলো। ওষুধের বাক্স বগলে নিয়ে ফার্গুসন প্রথম নিচে নামলেন, পেছন-পেছন জো নেমে এলো। নিচে মাটিতে এসে বেশ রাজার মতো চাল করে, জমকালো দেমাকি ভঙ্গি করে বসলো জো, কৌতূহলী নরনারী তার চারদিকে সসমে ভিড় করে দাঁড়ালে। এদিকে কানে-তালা-লাগানন অদ্ভুত বাজনা আর বিচিত্র চীৎকারের মধ্যে উল্কি-কাটা শাঁখের-মালা-পরা হাড়ের-গয়না-গায়ে ডাইনি-পূরুতেরা ফার্গুসনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সুলতানের প্রাসাদের দিকে। সেখানে পৌঁছুতে অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হলো। যখন পৌঁছুলেন, বেলা তখন তিনটে।

প্রাসাদে ঢুকতেই পাতার-ঘাগরা-পরা সুন্দর চেহারার কয়েকজন মেয়ে ফাণ্ডসনকে। সমাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলো। বিভিন্ন প্যাচালো আকারের মস্ত লম্বা নলচেয় করে তারা তামাক টানছিলো। তাদের মধ্যে দুজন ছিলো পাটরানী : সুলতানের মৃত্যু হলে তাদেরও জ্যান্ত বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে, কেননা মৃত্যুর পরপারে গিয়ে সুলতানকে সঙ্গ দিতে হবে তো! কারণ তাদের বিশ্বাস, রাজা হলেন অমর, তার জরা নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। দলের লোকের মনে কোনোরকমে এই বিশ্বাসটি টিকিয়ে রাখার উপরই রাজার ঐশ্বর্য আর অসীম প্রতিপত্তি নির্ভর করে আছে। তাই তাদের রীতি-নীতির ভেতর একেবারে মরীয়ার মতো অমর সাজবার আয়োজন। সুলতান অমর, তার মৃত্যু নেই, তাই মরে যাবার পরও তার জন্যে দরকার জীবনধারণের সব উপকরণ। তাই তাদের শবাগারগুলো ছোটোখাটো একেকটি প্রাসাদের মতো। বেশ শক্ত করে গাঁথা সেইসব কবর, ভেতরে ঐশ্বর্যের তাক-লাগানো সম্ভার; আশবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোশ, গয়নাগাটি আর সাজগোজের আয়োজন–সোনা তামা আর দামি পাথরের যেন ছড়াছড়ি। এই কবরখানার ভেতরে গুদোম-ঘর, আর তার মধ্যেই থরেথরে তেল, খাদ্য পানীয়, আরো পাঁচ রকমের কত-কী জিনিশ সাজানো। রাজাকে যে-ঘরে কবর দেয়া হয়, তারই আশপাশের ঘরে রাজার চাকরবাকরদেরও জ্যান্ত কবর দেবার ব্যবস্থা–সেই সঙ্গে জীবন্তই পোতা হতো রানীদের কিংবা হয়তো মেরে ফেলে তাদের পরে কবর দেয়া হতো। মোটমাট, মরা রাজার যাতে সেবার কোনো ত্রুটি না-হয়, এই জন্যে মরতে হতো অন্য মানুষদেরও। এই ব্যবস্থা চলে আসছে মিশরে, যুগ থেকে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে। আর মৃত্যুর এই জাঁকজমকের চূড়ান্ত পরিণতি হলো তার বিখ্যাত ও চমকপ্রদ বড় পিরামিড-মৃত্যুর কালো প্রাসাদ যেন আসলে, ফ্যারাওয়ের মৃত শরীরকে যে মমি করে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা তা-ই নয়, তার ওই কবরখানার মধ্যে বেঁচে-থাকার সবরকম

আয়োজনও থাকে। বহু যুগের ওপার থেকে এই-যে আঁটো, কঠিন, অনড় নিয়ম চলে আসছে, রানীরা সবাই তা জানে; তারা জানে যে অচিরেই অকালে তাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে। কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যু-সংবাদ জানা সত্ত্বেও সেই ছয় রানী বেশ নির্বিকার খোশ-মেজাজের সঙ্গেই তামাক টেনে যাচ্ছিলো।

খুব গম্ভীর ভাবভঙ্গি দেখালেন ফার্গুসন, আড়ম্বর করে মৃতপ্রায় সুলতানের শয্যার দিকে এগিয়ে গেলেন। সুলতানের বয়স খুব বেশি নয়, অল্পই, বড়ো-জোর হয়তো চল্লিশ হবে, কিন্তু তবু তার সমস্ত শরীরে জীর্ণতার রেখা সুস্পষ্ট : অজ্ঞান অবস্থায় সে পড়ে আছে তার শয্যায়, নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। কিন্তু ভালো করে তাকিয়েই তার চোখের তলার কালিমা দেখে ফার্গুসন অনায়াসেই বুঝতে পারলেন যে বহুদিনের বহু রকমের নেশা ও অত্যাচারে সে তার শরীরের যে-হাল করে এনেছে, তাতে তার আর বাঁচার আশা নেই। মুখে সে-কথা তিনি প্রকাশ করলেন না। বরং নীরবে, কোনো কথা না-বলে, বাক্স থেকে একটি কড়া ওষুধ বার করে কোনোরকমে সুলতানকে খাইয়ে দিলেন। তারই ফলে সুলতান একটু নড়ে-চড়ে উঠলো। একেবারে আসাড়, অবশ, মৃতপ্রায় হয়ে ছিলো সে, হঠাৎ তার মধ্যে প্রাণের চঞ্চল সাড়া দেখে উপস্থিত সকলে উল্লাসে কোলাহল করে উঠলো। ফার্গুসন কিন্তু এর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, তক্ষুনি প্রাসাদ থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে সোজা ভিক্টরিয়ার দিকে ফিরে চললেন।

জো বেশ জমকালো ভঙ্গিতে

জো বেশ জমকালো ভঙ্গিতে বসে ছিলো বেলুনের তলায়।কি ওপরে চুল্লির আগুন তাতিয়ে গনগনে করবার ব্যবস্থা করেছেন, আর ফার্গুসন গেছেন ডাইনি-পুরুতের সঙ্গে সুলতানের কাছে। কাজেই বাজারে যত লোক ছিলো, তারা জো-কে চাঁদের অন্যতম পুত্র ভেবে গদগদভাবে নানা ভঙ্গিতে তার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করছিলো। কতগুলি মেয়ে-পুরুষ অদ্ভুত এক আচাভুয়ো বাজনার সঙ্গে তালে-তালে পা ফেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচ দেখাচ্ছিলো তাকে। জোও একটু কপার ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ধন্য করছিলো, লোকজনেরা জো-র কাছে হরেক রকম জিনিশপত্র এনে উপচার হিশেবে হাজিরও করছিলো।

অবস্থা যখন এইরকম জমকালো, হঠাৎ জো দেখতে পেলো ফার্গুসন খুব দ্রুত পায়ে বেলুনের দিকে এগিয়ে আসছেন, প্রায় দৌড়চ্ছেন বলা চলে, আর তার পেছনপেছন ভীষণ হৈ-চৈ করে একদল কালো মানুষ অনুসরণ করে আসছে, তাদের পুরোভাগে আছে সেই বিকট চেহারার ডাইনি-পুরুতেরা। জো-র মনে হলো তারা ভীষণ রাগে ফেটে পড়তে চাচ্ছে, বিশেষ করে পুরুৎগুলো তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছে, তাদের বিষম কোলাহলে কান পাতা দায়, তবে রাগের ভাব স্পষ্ট। ব্যাপার কী? অবাক হয়ে ভাবলে জো। আগেকার সেই ভক্তি ও বিনয় হঠাৎ মন্ত্রবলে উবে গিয়ে এই উগ্রচণ্ড রাগি মেজাজ এলো কেন? তাহলে কি যাকে তারা চাঁদের সন্তান ভেবে অনুনয় করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো সেই ফার্গুসনের হাতে সুলতানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে? তাহলেই তো সর্বনাশ!

প্রায় ছুটেই এলেন ফার্গুসন-উত্তেজনায় তার কপালের শিরা রক্তের তীব্র চাপে ফুলে উঠেছে, সারা মুখে ভয়ে ছাপ স্পষ্ট, চোখদুটো কেমন চক করে উঠেছে। সোজা তিনি ছুটে এলেন মইয়ের কাছে। হয়তা সংস্কারের প্রবলতা তখনও কায়েমি হয়ে ছিলো বলেই তাকে উপেক্ষা করে, জনতা তখনও তাকে কোনোরকম আঘাত করা থেকে বিরত থেকেছে। চট করে মই বেয়ে কার-এ উঠে এলেন, ফার্গুসন, আর তার উত্তেজিত ইশারায় জো-ও আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে ক্ষিপ্র বিদ্যুতের মতো তার অনুসরণ করলে।

আর একমুহূর্তও দেরি কোরো না। নিশ্বাস রোধ করে উত্তেজিত গলায় ফাগুসন নির্দেশ দিলেন, নোঙর খোলবার সময় পর্যন্ত নেই, বরং দড়ি কেটে দাও তাড়াতাড়ি! শিগগির উড়ে যেতে হবে আমাদের।

কী হয়েছে? ব্যাপার কী; খুলে বললা তো ফার্গুসন।

ওই দ্যাখো, ওদিকে তাকিয়ে। আকাশের এক কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন ফার্গুসন।

চাঁদ! সমস্বরে বলে উঠলেন অন্য দু-জনে।

দিগন্তের বেশ কিছুটা ওপরে মস্ত এক সোনালি চাঁদ ভেসে উঠেছে। সেই চাঁদ আর ভিক্টরিয়া উভয়ই আকাশে শোভা পাচ্ছে একসঙ্গে। হয় পৃথিবীতে দুটি চাঁদ আছে, নয়তো শাদা চামড়ার লোকগুলি শঠ প্রবঞ্চক ও প্রতারক, মোটেই দেবতা নয় এরা–এই ভাবটাই

এখন সব লোকের মনে জেগে উঠেছে। তাই তারা রাগে, অবিশ্বাসে মারমুখো হয়ে উঠেছে।

হো-হো করে না-হেসে থাকতে পারলেন না ডিক।

কাজের লোকেরা যখন দেখলো যে ঐ শ্বেতাঙ্গ প্রতারকগুলো নকল চাঁদে করে পালিয়ে যাবার মৎলব আঁটছে, অমনি প্রবল স্বরে চ্যাঁচামেচি করে উঠলো। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল করতে-করতে বেলুন তাগ করে তীর ছুঁড়তে উদ্যত হলো তারা, কেউকেউ আবার কতগুলো চোখা বল্লম উঁচিয়ে ধরলে। কিন্তু একটি ডাইনি-পুরুৎ হাত তুলে তীরধনুক ব্যবহার করতে বারণ করলে জনতাকে। তারপর অসীম ক্ষিপ্রতায় সে গাছে ওপর উঠতে লাগলো : মনে-মনে সে মৎলব এঁটেছে যে নোঙরটা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে নেবে এই নকল চাঁদ।

কার থেকে কুড়ুল হাতে ঝুঁকে পড়লো জো। জিগেস করলে দড়ি কেটে দেবো?

একটু রোসো। কিন্তু ওই ডাইনি-পুরুটা যে উঠে আসছে!

আগে দেখাই যাক কী হয় না-হয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত নোঙরটা বাঁচাতে পারবো আমরা, ফার্গুসন বললেন, না-হলে, শেষটায় লক্ষণ খারাপ বুঝলে, দড়ি কেটে দেয়া যাবে।

ডাইনি-পুরুংটি ততক্ষণে ওপরে উঠে, এসে ডাল ভেঙে নোঙরটাকে মুক্ত করে ফেলেছে। যেই ডালটা ভেঙে গেলো, অমনি বেলুনের টানে আচমকা নোঙরটা উঠে গেলো ওপরে

আর লোকটার পা তাতে আটকে গেলো, লোকটাকে নিয়েই বেলুন উঠে এলো আকাশে, তলায় লোকটা ঝুলতে লাগলো।

নিচে যে-সব লোক এসে জমায়েৎ হয়েছিলো, তারা হতবাক হয়ে বিস্মিত চোখে দেখতে লাগলো, তাদের জাদু-জানা ঐন্দ্রজালিক পুরুৎ আকাশে ভেসে যাচ্ছে।

চমৎকার হলো! উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো জো।

লোকটা বেশ আঁকড়ে ধরেছে দড়িটা, নইলে-কেনেডি বললেন, কখন তলায় পড়ে যেতো।

লোকটাকে কি শূন্য থেকেই ফেলে দেবো? জো জিগেস করলে।

ছিঃ! ফার্গুসন বললেন, আমরা খামকা একটা লোকের মৃত্যু ঘটাবো কেন? বরং ওকে আমরা নিরাপদেই মাটিতে নামিয়ে দেবো, যদিও তার ফলে অবশ্য ওর দলবলের সকলের কাছে ওর প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম অনেক বেড়ে যাবে।

ভিক্টরিয়া এর মধ্যেই প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এসে ভেসে যাচ্ছিলো। প্রাণপণে দড়িটা আঁকড়ে ধরেছিলো সেই ডাইনি-পুরুৎটি; ভয়ে-আতঙ্কে তার চোখদুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরুতে চাচ্ছে, মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। এমনিভাবে বেলুন একটুক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে শহরের সীমা ছাড়িয়ে এলো।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফার্গুসন যখন দেখলেন যে তারা অনেকদূর চলে এসেছেন, তখন তিনি চুল্লির উত্তাপ এমনভাবে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন যাতে বেলুন সরাসরি

মাটির দিকে নেমে আসে। বেলুন যখন প্রায় কুড়ি ফিট উপরে, সেই ডাইনি-পুরুৎটি হঠাৎ বুকের ভেতর সাহস পেলে; যথেষ্ট পরিমাণ ভরসা সঞ্চয় করে সে চট করে লাফিয়ে নামলে মাটিতে, তারপর কোনো দিকে না-তাকিয়ে কাজের দিকে তীরের বেগে ছুটে চলে গেলো।

আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ বেলুনটি হালকা হয়ে যাওয়ায় আবার তরতর করে ওপর দিকে উঠে যেতে লাগলো।

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো তার ঝাঁপসা আবছায়া নিয়ে, তারপর সেই আবছায়াকে আরো-পাৎলা করে দিয়ে ধীরে-ধীরে আকাশের এককোণায় শোভা পেতে লাগলো সোনালি, নিটোল, জ্বলজ্বলে চাদ।

ওই দেখুন, চাঁদ যেন আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি জ্বলজ্বল করছে। জো বললে, বেশ দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছিলুম চাঁদের পুত্র হিশেবে, কিন্তু ওই চাদই কিনা শেষটায় আমাদের এই নতুন পরিচয় ভেস্তে দিয়ে ফাস করে দিলে যে আমরা চাঁদের কেউ নই।

এ-দেশের নাম কী, জানো? ফার্গুসন বললেন, এখানকার লোকেরা একে চাঁদের দেশ বলে। এখানকার বাসিন্দারা চিরকাল ধরে চাঁদের পুজো করে আসছে। তাছাড়া এ-দেশের মতো উর্বর দেশ আর-কোথাও সহজে মেলে না।

এই জংলি দেশেই কেন প্রকৃতি এমন অকৃপণ, সে-কথা ভাবলে অবাক লাগে। কেনেডি বললেন।

এই দেশই হয়তো একদিন সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সভ্য হয়ে উঠবে, সেই সম্ভাবনার কথাটাই বা তুমি ভাবছো না কেন? এমনও তো হতে পারে যে, ইয়োরোপে লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেলো যে কিছুতেই আর কুলোয় না; তখন তো তারা বাধ্য হয়েই এ-দেশে বসবাস করতে চলে আসবে।

কেনেডি জিগেস করলেন, তা-ই ভাবছে নাকি তুমি?

হ্যাঁ, আমার তো অন্তত তা-ই ধারণা। ফার্গুসন বলে চললেন, মানুষের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে এই ঘটনাই দেখতে পাওয়া যায়। তার প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশি যে, তাই দিয়েই আফ্রিকা একদিন সকলকে টানবে। নানা কলকজা যন্ত্রপাতি নিয়ে ইয়োরোপ থেকে লোক আসবে, বাসযোগ্য করে তুলবে এই কালো বন আর পাহাড়ি শ্যামলতা, গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর লোকালয়, নাব্য হয়ে উঠবে এর স্রোতস্বিনী, তারপর ধীরে-ধীরে হয়তো বিশাল এক সুসভ্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে এখানে। কে জানে হয়তো এ-দেশ থেকেই বাষ্প আর বিদ্যুৎশক্তির আরো চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর অনেক কিছু আবির্ভূত হবে।(১)

আমি সেই শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম। কেনেডি বললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব-টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসা মালালারাজি নদীস্রোতের কাছাকছি এসে পড়লো ভিক্টরিয়া। মস্ত-মস্ত লম্বা ঘাসে গোটা এলাকাটা ঢাকা, তারই মধ্য দিয়ে দলে-দলে বিশাল-কুঁজ-ওলা গোরুর দল চরে বেড়াচ্ছে। এই ঘাসের বন যেখানে গভীর, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সেখানে মাঝে-মাঝে সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা ও অন্যান্য হিংস্র

জন্তুরা আত্মগোপন করে থাকে। মাঝে-মাঝে মটমট করে ডাল ভেঙে মস্ত পাহাড়ের মতো হাতির পালকে নেমে আসতে দেখা যায়।

কী অপূর্ব শিকারের জায়গা। কেনেডি বলে উঠলেন।

হঠাৎ সমস্ত প্রকৃতি যেন কীসের আশঙ্কায় স্তব্ধ থমথমে হয়ে গেলো। ঝড়ের পূর্বলক্ষণকে চিনে নিতে মোটেই দেরি হলো না ফার্গুসনের। চাঁদ ডুবিয়ে দিলে কালো মেঘ, অন্ধকার করে এলো সারা আকাশ। উসেণ্ডা নামক গ্রামের অগুনতি কুটিরগুলোর ঝাঁপসা-কালো অস্পষ্টতার অনেক ওপরে ভিক্টরিয়া নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁকা রেখায় আকাশকে শতখান করে চিরে দিলে বিদ্যুতের তীব্র বিষম বাঁকা রেখা, তারপরেই কানফাটা আওয়াজ করে আলো ফেটে পড়লো, গড়িয়ে গেলো এক গুমগুমে ভয়ানক ধ্বনি, চারদিক থরথর করে কেঁপে উঠলো।

ওঠো, ওঠো—শিগগির উঠে পড়ো। ফার্গুসনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন কেনেডি, জো-ও তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো-পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন তারা। ঘুম তাড়াবার জন্য চোখ কচলাতে লাগলেন সজোরে।

আমরা কি নিচে নামবো? কেনেডি জিগেস করলেন।

না, তাহলে বেলুন ধ্বংস হয়ে যাবে, ফার্গুসন বললেন, বৃষ্টির আগে, প্রবল বাতাস শুরু হবার আগেই, আমাদের ওপরে উঠে যেতে হবে! এই বলে তিনি চুল্লির আগুন পুরোদমে চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

উষ্ণ জঙ্গলের এই ঝড় যেমন নিমেষের মধ্যে তার প্রচণ্ডতা নিয়ে হাজির হয়, তেমনি তুলকালাম কাণ্ড বোধহয় আর-কোথাও হয় না। আবার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তীব্র এক বিদ্যুতের বাঁকা রেখা, যেন আকাশকে এফোঁড়-ওফোড় করে ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে সে, তারপর ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিদ্যুৎ থেকে-থেকে চমকে উঠলো, যেন সারা আকাশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে নেমে এলো প্রবল বর্ষণ।

বড্ড দেরি হয়ে গেলো আমাদের, ফার্গুসনের গলায় ত্রাস আর চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট, এখন এই বৈদ্যুতিক আকাশ ছুঁড়ে এই গ্যাস-ভর্তি বেলুন নিয়ে আমাদের উঠতে হবে। বুঝতে পারছো তো কী সাংঘাতিক অবস্থা— যে-কোনো মুহূর্তে আগুন লেগে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

আরো-গনগনে করে তোলা হলো চুল্লির আগুন। বেলুন এমন তীব্রভাবে কেঁপে উঠলো, যেন ঝড় এসে তার ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে। বেলুনের চারপাশে যে-একটি আবরণ পরানো ছিলো তাতে অনেক বড়ো-বড়ো ফুটো হয়ে গেলো, আর হাওয়া এলো ভেতরে, ভীষণ আওয়াজ করে দাপাদাপি শুরু করে দিলে বাতাস, আর তার সঙ্গেই তাল বজায় রেখে বড়ো-বড়ো শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো বেলুনের গায়ে। কেনেডির মুখ শুকিয়ে এলো, ফার্গুসনের কপালেও চিন্তার রেখা দেখা গেলো, কেবল জো-র মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই সে ভয় পেয়েছে কি না। বিদ্যুতের তীব্র-নীল শিখা কুটি করে শাসাতে লাগলো চারদিকে, কিন্তু তবু এতসব সত্ত্বেও, সমস্ত বাধা ঠেলে বেলুন ওপরে উঠতে লাগলো।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! ঝড়ের বাতাসের মধ্যে ফার্গুসনের ভেজা গলা করুণ শোনালো, নিচে পড়লে তেমন জোরে পড়বো না, এই ভরসা থাকলেও যে-কোনো বিপদের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে-যুঝতে বেলুনটি যখন ঝোড়ো মেঘের ওপর উঠে এলো, তখন মাত্র পনেরো মিনিট কেটেছে। আগেও একবার উষ্ণ জঙ্গলের কালো ঝড়ের পাল্লায় পড়েছিলেন তারা, কিন্তু সেবার বিপদের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিলো। ঝড়ের আওতার বাইরে চলে এসে বিদ্যুতের তীব্র বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তারা।

সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত! নিচে ভীষণ মেঘ তার কালিমা দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে যেন চিরকালের জন্যে ঢেকে ফেলে দিতে চাচ্ছে, অথচ তার ওপর দিয়ে ভিক্টরিয়া ভেসে যাচ্ছে নিরাপদ ও অনুকুল হাওয়ায়। আকাশ, নিচের মেঘ, চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। আর কত তারা ফুটে আছে এই ওপরে, ঝিকমিক! আশ্চর্য! অদ্ভুত মাথার ওপর তারা-আঁকা আকাশ, আর নিচে উন্মত্ত কালো মেঘের প্রচণ্ড দাপাদাপি।

এত সহজেই যে বিপদ থেকে বাঁচতে পেরেছি সেই জন্যে ঈশ্বরকে অনেব ধন্যবাদ! ফার্গুসন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। এখন প্রায় হাজার বারোশো ফিট ওপরে আছি আমরা, কাজেই আর-কোনো ভয় নেই।

কেনেডি বললেন, তাজ্জব অভিজ্ঞতা হলো কিন্তু! যে-পরিস্থিতিতে পড়েছিলুম, এখন তার কথা ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে।

জো কেবল একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সে কথায় সায় দিলে।

———

১. জুল ভের্ন তার এই ধারণাকে নিয়ে দ্য বারজাক মিশন নামে মস্ত একটি রহস্যময় উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

আকাশ একেবারে পরিষ্কার

পরদিন সকালে কিন্তু আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো। শান্ত শাদা মেঘের গা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রোদ, চারদিক আলোয় ভরা, সুন্দর মন্দ-মধুর হাওয়া দিচ্ছে। আবার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো নিচের পৃথিবী।

হাওয়া অনুকুল, উত্তর-পূর্ব দিকে ভেসে চললো ভিক্টরিয়া। ফার্গুসন হিশেব করে দেখলেন যে বিষুবরেখা থেকে তারা এখন প্রায় পৌনে দুশো মাইল দূর দিয়ে চলেছেন। পাহাড়ি এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছে এবার বেলুন, মস্ত বড়ো পাহাড়, নাম কারাওয়ে। আফ্রিকিদের মধ্যে চলতি একটা কথা আছে, যাতে একে বলা হয়েছে নীল-নদের দোলনা। এই পাহাড়ই উকেরিঙি নামক বিরাট জলাশয়ের একদিকে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই হ্রদের নতুন নাম দেয়া হয়েছে ভিক্টরিয়া—আর এরই কাছাকাছি, অল্প দূরের ব্যবধানে, দক্ষিণ-পশ্চিম মালভূমির প্রশস্ত উপত্যকাতে বিভিন্ন ধাপে নাইভাসা, বারিঙ্গো, মাগাদি প্রভৃতি কয়েকটা ছোটো হ্রদ। প্রথমে দূর থেকে একটা গ্রাম চোখে পড়েছিলো, তারপরেই হ্রদগুলো দেখা দিলে। ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসের তিন তারিখে ক্যাপ্টেন স্পেক এখানে পদার্পণ করেছিলেন। ফার্গুসন উল্লসিত হয়ে উঠলেন : যে-সব জায়গার ওপর দিয়ে তার যাবার ইচ্ছে ছিলো, বেলুন সত্যি-সত্যি সেইসব আকাঙ্ক্ষিত দেশের ওপর দিয়েই চলেছে। দুরবিন হাতে তিনি অজানা দেশের প্রতিটি জিনিশ ভালো করে দেখতে লাগলেন।

কারাগুইব রাজ্যের রাজধানী চোখে পড়লো তারপর : গোটা পঞ্চাশেক বাঁশপাতার গোল কুটির, তাই দিয়েই আফ্রিকিরা এই রাজধানী গড়েছে।

দুপুরবেলা ভিক্টরিয়া হ্রদের ওপর দিয়ে উড়ে চললো বেলুন। এই বিশাল জলরাশিকে ক্যাপ্টেন স্পেকই ভিক্টরিয়া-নায়েঞ্জা নাম দিয়েছিলেন। ভিক্টরিয়া ইংরেজদের রানী, আর নায়েঞ্জা কথাটা এ-দেশি, তার মানে হলো হ্রদ।

এবার আমরা আসল পথ ধরেছি। এক্ষুনি হয়তো আমরা নীল নদকে দেখতে পাবো। এই হ্রদই যে নীল নদের উৎস, তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই।

ফাণ্ডসনের আন্দাজে যে মোটেই ভুল নেই একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। একপাশের গিরিমালার মধ্য দিয়ে সত্যিই দেখা গেলো প্রবল এক জলধারা অপর দিক দিয়ে ধেয়ে চলেছে।

ঐ দ্যাখো! ঐ দ্যাখো! উল্লসিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফার্গুসন, আরবেরা ঠিকই বলে— এই সেই জলধারা যার প্রতিটি জলকণা গিয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। এরই নাম নীল নদ।

মিশরের আশ্চর্য সভ্যতা যখন গড়ে উঠেছিলো, নীল নদ তখন অকৃপণ হাতে তার পেছনে তার প্রসাদকণা বিলিয়েছিলো। চারদিকে ধুলো, ধুলো, মরা ধুলোর মরুভূমি —আর তারই ওপর নীল নদের দু-কুল জুড়ে যেন একফালি সবুজের উদ্দাম সম্ভার। নীল নদের কোল ঘেঁসেই ঘনসবুজ ঘাস, স্নিগ্ধ শস্যের খেত, কিন্তু তারপরেই, মিশর থেকে বেরিয়ে এলেই, রুক্ষ ধুলো, মরুভূমির হলদে লোলুপ বাহু। প্রাণীর রাজ্য বলতে শুধু এই সবুজের ফালিটুকুই, কেননা বাঁচবার জন্যে যা-কিছু আয়োজন তার সবটুকুই এইখানটিতেই। আর সে-আয়োজন কী প্রচুর। যেন সবুজের কূল-ছাপা বন্যা। অথচ এই ফসলের ফালিটুকুর

বাইরে এক পা বাড়ালেই দেখা যাবে বাঁচবার আয়োজন ছিটেফোঁটাও নেই, কেবল খাঁ-খাঁ করছে শুকনো, রক্তিম, তপ্ত মৃত্যুর দেশ।

জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এমন স্পষ্ট দাগ কেটে পৃথিবীর আর-কোথাও ভাগ করে দেয়া হয়নি। অনায়সেই মিশর দেশে এমন জায়গা বেছে দাঁড়ানো যায় যেখানে এক পা পড়েছে শস্যশ্যামল মাটির ওপর আর অন্য পা রুক্ষ মরুভূমির তপ্ত রক্তিমতায়–এক পা জীবনের দেশে আর আরেক পা মৃত্যুর দেশে।

অনেক, অনেক কাল আগে, আদি পৃথিবীতে, আশপাশের নানা দেশের যাযাবর মানুষেরা ধীরে-ধীরে নীল নদের খবর পেয়েছিলো। খবর পেয়েছিলো, কাছেই আছে এমন-এক দেশ, যেখানে প্রাণ তার সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তের আকাশ লক্ষ্য করে, না-চাইতে যেখানে পৃথিবীর কাছ থেকে অনেককিছু পাওয়া যায়, তাই ওইসব বেদুইন মানুষের নানান দল এসে জমতে লাগলো নীল নদের এই কিনারায়। কেউ এলো আফ্রিকারই অন্য এলাকা থেকে, কোনোদল এলো আরব্য অঞ্চল থেকে, হয়তোবা সুদূর এশিয়া থেকেই এলো কেউ-কেউ। আর যতই দিন গেলো, ততই এইসব নানা দলের মানুষের মধ্যে মিশোল হতে লাগলো, আর তারাই হলো আদি মিশরের বাসিন্দা।

শেষকালে নিজেদের জন্যে একটা নামই তারা ঠিক করে ফেললো : সে-নামটা ভারি অদ্ভুত। তাদের ভাষায় তারা যে-নাম দিলে, তার মানে হলো, মানুষ-শুধু মানুষ। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে মানুষ বলে ডাকতে শিখলো। তারা এইভাবে নিজেদের মানুষ বলে ডাকতে শিখে গেলো, তার মানে কিন্তু এই যে, পৃথিবীর তারাই হলো একমাত্র মানুষ, আর-কোথাও মানুষ নেই, আর-কেউ মানুষ নয়। মানুষ আর মিশরের লোক-দুইই তাদের

কাছে এক কথা। তাহলে কি তারা জানতো না যে পৃথিবীতে আরো বহু রকমের মানুষ আছে? তা তারা ভালো করেই জানতো কেবল অন্যদের ওরা মানুষ বলে মানতো না, তাদের কাছে অন্যরা হলো বিদেশী, আর বিদেশী মানেই কিছুটা অন্য ধরনের, মানুষের চেয়ে কিছুটা খাটো, কিছুটা নিচু। মানুষ মানে কেবল মিশরের মানুষ, আর-কেউ নয়।

এমনতরো যে হলো, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তার কারণটা খুবই স্বাভাবিক। রুক্ষ হলুদ মরুভূমির ভেতর একটুখানি জায়গায় প্রাণ তার সবুজ নিশান উড়িয়েছে, . আর এই একরত্তি জায়গাটুকুই তাদের কাছে পুরো জগৎ : তার বাইরে পৃথিবী বলতে যে আর-কিছু আছে বা থাকতে পারে, তা তাদের পক্ষে ভালো করে বুঝতে পারাই কঠিন ছিলো। মিশরই গোটা পৃথিবী, মিশরের অধিবাসীরাই কেবল মানুষ—শুধু যে এইসবই তারা ভাবতো তা-ই নয়, নদীর বেলাতেও এমনি। তাদের দেশের ওই-যে নীল নদ, ও ছাড়া পৃথিবীর আর-কোথাও যে নদী আছে বা থাকতে পারে, এমন কথা তারা যেন ভাবতেই পারতো না, তাই নদীটার ও-রকম নাম দিয়েছিলো তারা : নীল-বা নাইল; তাদের ভাষায় কথাটার মানেই হলো নদী, শুধু নদী। তার মানে, নদী আর তাদের ওই নীল—একই জিনিশ; কারণ ওই নীল নদ বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে, আর সেই কারণে তাদের ভাষায় উত্তর দিকে এগুনো, আর নদীর স্রোত বরাবর এনো একই কথা আবার উজানে যাওয়া বা দক্ষিণ দিকে যাওয়াদুই-ই হলো এক। নীল ছাড়া আর-কোনো নদীর নাম তারা জানতো না, তাই তাদের ধারণায় নীল নদের স্রোত যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে অন্য-সব নদীর স্রোতও তা-ই হতে বাধ্য। তাদের ওই ছোট্ট বিশ্বে এই একটি নদী ছাড়া আর-কোনো নদী ছিলো না, কাজেই পৃথিবী বলতে তারা কতটুকু জায়গা বুঝতো, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। আর তাই তারা মনে করতো, কালো রঙটাই ভালো, লাল মোটেই ভালো না। কেননা এই-যে তাদের একরত্তি পৃথিবী তার

রঙটা কালো, আর তার পরেই শুরু হয়েছে মরুভূমি যার মাটি রুক্ষ, শুকনো, তপ্ত—লাল রঙের।

এই-ই নীলনদ! কেনেডি আশ্চর্য গলায় বললেন।

জোও চিৎকার করে উঠলো, আশ্চর্য তো! এই কিনা নীলনদ।

বড়ো-বড়ো পাহাড় আর পাথর পড়ে আছে নীল নদের গতিপথে। কোথাও জলপ্রপাত, আর কোথাও-বা ফেনিল জলধারার মত্ত উচ্ছ্বাস তীব্রবেগে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নদীর দু-পাশ ধরে অনেক গ্রাম আর স্নিগ্ধ শ্যামল শস্যের সম্ভার। গ্রামের বাসিন্দারা বেলুনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে নানারকম অঙ্গভঙ্গি আর অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের বিষম ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগলো।

কেনেডি বললেন, কী সর্বনাশ! এখানে নামতে গেলে তো মস্ত বিপদ হবে দেখছি!

তা সত্ত্বেও আমাদের নামতেই হবে, ফার্গুসন দৃঢ় গলায় জানালেন। নয়তো আমার অভিযানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অন্তত সিকি ঘণ্টার জন্যে হলেও নামতে হবে—সবকিছু দেখে-শুনে নেবার জন্যে। উত্তর দিক থেকে যে-সব অভিযানকারী এসেছিলেন, তাঁদের মাইল পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছেছি এখন। নামবোই, তবে, খুব সাবধানে।

ভিক্টরিয়া প্রায় হাজার-দেড়েক ফুট নেমে এলো। হঠাৎ ফার্গুসন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : আরে! ওই-যে নদীর ঠিক মধ্যিখানে একটা ছোটো দ্বীপের মতো রয়েছে। গোটা-চারেক

গাছও তো রয়েছে দেখছি! ওটার নাম কী জানো? বেঙ্গা দ্বীপ। ভালোই হলো একদিক থেকে—এখানেই নামবো আমরা।

কিন্তু এখানে যে লোকজন থাকে বলে মনে হচ্ছে, জো জানালে।

তাইতো-ঠিকই তো! ওই-যে প্রায় জন-কুড়ি কালো মানুষ দেখা যাচ্ছে মাঠের ওপর। তাহলে তো ভারি মুশকিল হলো।

ওরা যাতে পালিয়ে যায় এমন কোনো ব্যবস্থা করলে হয় না?

হ্যাঁ, তা-ই করববা আমি।

সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে রক্ত চক্ষু জ্বেলে জ্বলছে, এমন সময় ভিক্টরিয়া মাটির দিকে নেমে আসতে লাগলো। নানাভাবে হাত-পা ছুঁড়ে বিকট গলায় চাচামেচি করতে লাগলো নিচের অধিবাসীরা। একজন তার মাথার পাতার গোল টুপিটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে। অমনি কেনেডি ক্ষিপ্র হাতে বন্দুক তুলে নিলেন। পলকে লক্ষ্য স্থির করে সেই উড়ো টুপিটা তাগ করে গুলি ছুঁড়লেন তিনি, অমনি টুপিটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো। তাতেই কিন্তু কাজ হলো। আফ্রিকিরা বিষম ভয় পেয়ে চো-চা দৌড়ে ঝপ-ঝপ নদীতে লাফিয়ে পড়লো, তারপর সাঁৎরে দু-পারে উঠে গেলো। দ্বীপ থেকে চলে গেলেও মোটেই তারা শান্ত হলো না কিন্তু—দু-পার থেকে অজস্র তীর ছুঁড়তে লাগলো তারা। তাতে অবশ্য গাছের নিরাপদ আড়ালে নোঙর করে রাখা ভিক্টরিয়ার গায়ে আঁচড়টুকুও পড়লো না। বিষের তীরের নাগলের বাইরে ভিক্টরিয়া হাওয়ায় কেবল আস্তে-আস্তে দুলতে লাগলো।

দড়ির মই বেয়ে প্রথমে জো নিচে নেমে এলো, তারপর কেনেডি আর ফার্গুসন ধীরে-ধীরে নামতে লাগলেন।

কেনেডি প্রথমটায় নামতে রাজি হননি। আমি আবার খামকা নিচে নেমে কী করবো?

আমার একজন সাক্ষী থাকা দরকার, না-হলে লোকে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? স্মিত মুখে জানালেন ফার্গুসন।

বেশ, চলো তাহলে।

জো, তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থেকো–ভালো করে পাহারা দেয়া চাই।

দ্বীপের একদিকে ছোটো একটি টিলা, দু-জনে চললেন সেদিকে। টিলার গায়ে ঝোপঝাড় গজিয়েছে, ফার্গুসন সোজা সেই ঝোঁপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর নিচু হয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন তিনি। কাটাগাছের খোঁচা খেয়ে তার হাত-পা ছড়ে গেলো, রক্ত ঝরলো, কিন্তু তবু তিনি ক্ষান্ত হলেন না। ডিক কেনেডি অবাক হয়ে বন্ধুর রকম-শকম দেখতে লাগলেন। হঠাৎ ফার্গুসন উৎসাহী গলায় বলে উঠলেন, এই-যে, এই-যে, পেয়েছি! দ্যাখো, ডিক, দ্যাখো!

আরে! এ-যে ইংরেজি হরফ দেখতে পাচ্ছি।

ফার্গুসন কোনো সাতরাজার ধন বা গুপ্তধন খোঁজেননি, তিনি খুঁজছিলেন টিলার গায়ে বিশেষ একটি পাথরে স্পষ্ট হরফে দুটি ইংরেজি অক্ষরে খোদাই করা : এ. ডি.।

এ. ডি. হলো অ্যানড়িয়ে ডেবোনার নামের আদ্য অক্ষর। ফার্গুসন বললেন, ডোবোনা ছিলেন খার্তুমের একজন ব্যবসায়ী, হাতির দাঁতের খোঁজে ঘুরতে-ঘুরতে

ভদ্রলোক নীল নদের উৎসের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন।

এই অক্ষরদুটি যে তারই নির্ভুল প্রমাণ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

তাহলে এবার বিশ্বাস হলো তো?

নিশ্চয়ই! এটা যে নীল নদ, তা মানতেই হয়। এমন অকাট্য প্রমাণের পরে তা আর কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কেনেডি স্বীকার করলেন।

আরেকবার অক্ষরদুটির দিকে কেমন জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন ফার্গুসন। তারপর বললেন, চলো এবার, শিগগির চলো বেলুনের দিকে। খুব সাবধান কিন্তু আবার নদী পেরুবার চেষ্টা করছে আফ্রিকিরা।

এর প্রায় দশ মিনিট পরেই আবার ভিক্টরিয়া শূন্যে উঠলো, এবার তার গায়ে পৎপতিয়ে উড়ছে গ্রেটব্রিটেনের পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক।

দূরে মিলিয়ে গেলো নীলনদ

আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেলো নীলনদ আর তার আশপাশের অঞ্চল। তারপরে হাওয়া এলো প্রবল, আর কালো রাত চোখের সামনে সব ঢেকে দিলে। মস্ত একটা গাছের উপর নোঙর করা হলো বেলুন। যথারীতি ন-টা থেকে বারোটা পর্যন্ত পাহারা দিলেন ফার্গুসন, নির্দিষ্ট সময়ে কেনেডিকে ঘুম থেকে তুলে সাবধান করে দিলেন, খুব হুঁশিয়ার থেকো কিন্তু।

কেন বলোতো! সন্দেহের কিছু কারণ ঘটেছে নাকি?

না, তবে গাছের ঠিক নিচে কিরকম-একটা শব্দ শুনেছি একবার। কিন্তু শব্দটা যে কীসের তা বুঝতে পারিনি।

দোলনার রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়ে কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিক। একবার যেন শো-দুই গজ দূরে আলোর এক ফুলকি জ্বলে উঠলো, পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেলো আবার। ছোট্ট সেই স্ফুলিঙ্গ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আর্ত এক চীৎকার স্তব্ধ রাতটাকে চিরে দিলে। কোনো জন্তুর গলার আর্তনাদ? না কোনো রাত-জাগা পাখির? মানুষের গলাও কি হতে পারে?

চোখে দুরবিন লাগিয়ে ডিক অন্ধকারের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়লো না। হঠাৎ মনে হলো কতগুলো কালো-কালো ছায়া যেন তাদের গাছের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। এমন সময় মেঘ একটু পাৎলা হয়ে গেলো, আর ছেড়া-

ঘেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়লো। ডিক স্পষ্ট দেখতে পেলেন কতগুলো লোক এসে তাঁদের গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। তক্ষুনি তিনি ফার্গুসনকে জাগিয়ে তুললেন।

চুপ! ডিক সাবধান করে দিলেন ফার্গুসনকে, আস্তে কথা বলো 1 জো আর আমি মই বেয়ে বেলুন থেকে গাছটায় নেমে যাই।

তা-ই ভালো। ফাগুসন তার প্রস্তাবে সায় দিলেন, আমি বেলুনে থেকে চট করে যাতে আকাশে উড়ে যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করে রাখবো। কিন্তু সাবধান, নেহাৎ বেগতিক না-দেখলে বন্দুক চালিয়ো না। খামকা এদের কাছে আমাদের উপস্থিতি জানিয়ে কোনো লাভ নেই।

প্রথমে কেনেডি নামলেন চুপিসাড়ে, তাঁর পেছন-পেছন নামলে জো, তেমনি নিঃশব্দে। গাছের মগডালেই একটা সুবিধাজনক জায়গা ঠিক করে ভালোভাবে জোকে নিয়ে বসলেন কেনেডি। কান পেতে যা শুনলেন, তাতে বুঝতে পারলেন যে কতগুলো লোক গাছে উঠে আসছে। বুনো পোকামাকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে গায়ে তেল মেখে এসেছে তারা, তার বোঁটকা দুর্গন্ধে নাক জ্বলে গেলো তার।

হঠাৎ একটু পরে কেনেডির হাত টিপলো জো। সাপের মতো আস্তে, নির্ভুলভাবে, লোকগুলো চারপাশ দিয়ে ডালে-ডালে এগিয়ে আসছে। যখন দুটি মাথা কাছে এসে পড়লো, ডিক নির্দেশ দিলেন, গুলি চালাও!

মাথা দুটি লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো দু-জনের বন্দুক। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট একটা আর্তনাদ উঠলো, চটপট অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো লোকগুলো, আর সেই ধাবমান পদশব্দের মধ্যে আবার মমঘাতী আর্তনাদ উঠলো, কে যেন ফরাশিতে বলছে,বাঁচাও! বাঁচাও!

ফার্গুসন বেলুন থেকে উত্তেজিত গলায় বললেন, ডিক, শুনছো, কোনো-এক ফরাশি বিপদে পড়েছে। নির্ঘাৎ ওই জংলিগুলোর হাতে পড়েছে! তাকে উদ্ধার নাকরে আমরা কিছুতেই নড়বো না!

কিন্তু ওই ভীষণ জংলিদের তাড়াবো কী করে?

এখন যেমনভাবে তাড়ালে! ওরা যে আগ্নেয়াস্ত্রে অভ্যস্ত নয়, তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছে। ওদের সেই ভয়-পাওয়ার সুযোগই নিতে হবে আমাদের। সকাল অব্দি অপেক্ষা করতে হবে অবশ্য, কেননা এই অন্ধকারে ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। এরই মধ্যে আমাদের একটা ফন্দি বার করতে হবে, কী করে এই ফরাশিকে মুক্ত করা যায়।

এদিকে যদি আজ রাতেই জংলিরা ওঁকে মেরে ফ্যালে?

তা তারা করবে না। এ-সব জয়গায় জংলিরা সাধারণত দিনের বেলাতেই তাদের বন্দীদের হত্যা করে থাকে।

আজ রাতেই তো সুবিধে বেশি। জংলিরা এখন নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে দূরে সরে গেছে- এক্ষুনি কি আর সে-ভয় কাটিয়ে তারা ফিরবে? এদিকে সেই ফরাশি লোকটা হয়তো মিথ্যেই ঘাবড়ে থাকবে।

তার আর কী আছে? এক্ষুনি তাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি। এই বলে ফাণ্ডসন সেই সাহায্যপ্রার্থীকে উদ্দেশ করে ফরাশিতে চেঁচিয়ে বললেন, আপনি যে-ই হোন, নির্ভয়ে থাকুন। এখানে আপনার তিন বন্ধু আপনার সাহায্যের জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

বন্দীর কাছ থেকে কোনো উত্তর এলো না, বরং হঠাৎ মিলিত কণ্ঠে জংলিরা উৎকট চেঁচিয়ে উঠলো।

সর্বনাশ! ডিক বললেন, জংলিরা নির্ঘাৎ একে এক্ষুনি সাবাড় করে দেবে।

কিন্তু কীই-বা করবে তুমি এই অন্ধকারে? কিছুই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার জো বললে, এই অন্ধকারকে আলো করে দেবার কোনো উপায় নেই। কি?

ফার্গুসন সরাসরি এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবলেন একটু পরে বললেন, ঠিক আছে, তবে তা-ই হোক। বন্দুক হাতে তৈরি থেকো তোমরা–হয়তো গুলি চালাতে হবে আমাদের। জো, তুমি পাথরভরা থলে ধরে থাকবে, ইশারা করলেই তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আর ডিক-তোমার হাতে বন্দীকে তুলে নিয়ে আসার ভার। কিন্তু মনে রেখো, আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না। জো, তুমি নিচে গিয়ে চট করে নোঙরটা খুলে দিয়ে দেলনায় ফিরে এসো।

নিমেষে তার কর্তব্য পালন করলে জো। চুল্লির বৈদ্যুতিক ব্যাটারিতে দুটি তামার তার ব্যবহার করা হচ্ছিলো, ফার্গুসন সে-দুটিকে হাতে নিয়ে দুটো কয়লার টুকরো চেঁছেচেঁছে

তাদের মুখ ছুঁচলো করে দিলেন, তারপর দুটিকেই তারের মুখে বাঁধলেন। ব্যবস্থা শেষ হলে, দোলনায় দাঁড়িয়ে দু-হাতে অঙ্গারদুটি ধরে একসঙ্গে ছুঁইয়ে দিলেন। অমনি চোখ-ধাঁধানো এক শাদা আলো জ্বলে উঠে আশপাশের কালো অন্ধকারকে দূর করে দিলে।

সেই আলোয় দেখা গেলো, একটি খোলা মাঠের মাঝখানে মস্ত এক বাওবাব গাছের ডগায় তাঁদের বেলুন বাঁধা। দূরে, মাঠের এক প্রান্তে, কতগুলি নড়বোড়ে নিচু খোড়ো বাড়ি, তার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক; আর, বেলুনের ঠিক নিচেই দেখা গেলো মাটিতে পড়ে আছে বছর তিরিশ বয়সের এক শ্বেতাঙ্গ, শতছিন্ন তার জামাকাপড়, সারা শরীরে বহু ক্ষতের চিহ্ন, তা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

তার পোশাক দেখেই জো চীৎকার করে উঠলো, একজন মিশনারি দেখছি! এঁকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। দৃঢ় গলায় ফার্গুসন বলে উঠলেন।

লোকগুলো সম্ভবত বেলুনকে ভেবেছিলো মস্ত এক ল্যাজ-ঝোলা জ্বলন্ত ধুমকেতু বলে। ফার্গুসন তার হাতের আলোকে কুটিরগুলোর দিকে ফেরাতেই তারা ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বেলুনের দোলনা মাটিতে ঠেকতেই ডিক নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে ফরাশি ভদ্রলোককে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন, আর তক্ষুনি জো নুড়ি-ভরা বস্তাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই বেলুন সবশুদ্ধু ভীষণ দুলে উঠলো, এক ঝাঁকুনিতে প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এলো। ফার্গুসন তামার তার দুটিকে আলাদা করে দিলেন। চারদিক আবার

কালো অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে পলকে তিনি কব্জিঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন : রাত তখন একটা।

দোলনায় উঠেই ফরাশি ভদ্রলোকটি হতচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরতেই ফার্গুসন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জানালেন, আর-কোনো ভয় নেই আপনার।

হ্যাঁ, খুব বেঁচে গেছি, ভাঙা ইংরেজিতে অবসন্ন গলায় সেই ফরাশি ভদ্রলোক বললেন, ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে দৈব আমাকে বাঁচিয়েছে। আপনারা ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছেন—আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তাহলেও আর আমি বাঁচবো না, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। একটু পরেই যে আমার মৃত্যু হবে, তা আমি ঠিক জানি। এ-কথা বলেই তিনি ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

সেই রক্তাপ্লুত শীর্ণ দেহকে একটি কম্বলের উপর শুইয়ে দেয়া হলো; ফাণ্ডসন দ্রুত হাতে তার ক্ষতস্থলে পট্টি বেঁধে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিলেন।

এরপরে যখন তাঁর জ্ঞান হললা, ফরাশি ভাষাতেই তিনি তার কাহিনী বলে গেলেন। তিনি জন্মেছিলেন গরিবের ঘরে। ছেলেবেলা থেকেই তার ইচ্ছে ছিলো ধর্মযাজক হবেন, সেইজন্যে তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চে যোগদান করেন; আফ্রিকায় যখন তিনি এলেন, তার বয়স মাত্র কুড়ি। বহু বিপদ ও উৎপাত সহ্য করে শেষকালে নীলনদের উৎসস্থলের কাছাকাছি এসে হাজির হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে, তার ধর্মকে আর তার সহৃদয়তাকে মোটেই ভালো চোখে দ্যাখেনি, ফলে এই নিষ্ঠুরদের হাতে দু-বছর তাকে বন্দীভাবে কাটাতে হয়, তার ওপর চলতে থাকে অবর্ণনীয় অত্যাচার। তবু তাদের জন্যে

তিনি দিনরাত প্রার্থনা করেন, অনবরত সদুপদেশ দেন, শোনান সুসমাচারের গভীর বাণী। শেষে একদিন গৃহযুদ্ধের শেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো; তারপর তারা সেখান থেকে নতুন আস্তানার খোঁজে বেরুলো—যাবার সময় তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করে গেলো। একটু সুস্থ হয়ে আবার তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ধর্মপ্রচার ও মানবসেবার কাজে। তার মতে সভ্যতার যা সবেচেয়ে বড়ো উপঢৌকন, তিনি যে-ভেট নিয়ে এসেছেন এই অজ্ঞাত মহাদেশে, সেই প্রীতির বাণীই তিনি নানা স্থানে ঘুরে-ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন। আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র আদিবাসী যারা, সেই নিয়াম-নিয়ামদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি বছরখানেক বসবাস করেন। এমন সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাদের সর্দারের মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুর জন্যে তারা তাকেই দায়ী করে, এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। গত চল্লিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম নানাপ্রকার অত্যাচার চলে তার ওপর। যদি অভিযাত্রীরা তাকে না-বাঁচাতেন, তাহলে আজ রাত দুপুরেই তার হত্যাকাণ্ড সমাধা হতো।

কোনো খেদ নেই আমার, ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, মরতে বসেছি বলে কোনো পরিতাপ নেই। কখনও আমি বিলাপ করিনি আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে, মনস্তাপে বা সন্তাপে কখনও বিচলিত হয়ে পড়িনি। মৃত্যুর আগে এই-যে আমার শ্বেতকায় দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা হলো আর জীবনের শেষ মুহূর্তে এই-যে মাতৃভাষায় দুটো কথা কইতে পারলাম, এর মধ্যে কি ঈশ্বরের অসীম করুণা প্রচ্ছন্ন নেই? আমার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে শেষবার আমি প্রার্থনা করবো আপনাদের যাত্রা যাতে নিরাপদ ও সার্থক হয়। দয়া করে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিন।

তাঁর অন্তিম প্রার্থনা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না তিনি, কেনেডির কোলে তার নিপ্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো। নীরবে দাঁড়িয়ে শোকার্ত অভিযাত্রীগণ এই করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

এই দেশের জন্যেই বহু রক্তক্ষরণ হয়েছে এর। এখানেই একে আমরা সমাহিত করবো। ফার্গুসন ফিশফিশ করে বললেন।

পরদিন কঙ্গোর উত্তর-সীমান্তের কিছু দূরে নেমে এই ফরাশি ধর্মযাজকের অন্ত্যেষ্টি সমাপন করা হলো। কবরের উপরে কাঠের ক্রুশ বসিয়ে দিয়ে ফার্গুসন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কী ভাবছো?

ভাবছি? কিছু না। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন ফার্গুসন।ভাবছি প্রকৃতির কী নির্মম পরিহাস! আজীবন অসীম দারিদ্র্য আর দুঃখের মধ্যে কাটিয়ে তিনি কিনা অন্তিম শয়নে শুলেন সোনার ওপর!

সোনা। বলো কী?

হ্যাঁ, সোনার খনি! এই যে-সব পাথরের টুকরো তোমরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে, এগুলোর ভিতর রেণুর মতো ছড়িয়ে আছে সোনা। তার পরিমাণ কত হবে জানো?– এখানে যত সোনা ছড়িয়ে আছে, তাতে শুধু গোটা অস্ট্রেলিয়া আর ক্যালিফর্নিয়াকেই ধনী করা যায় না, অনেক মরুভূমিকেও ভরিয়ে তোলা যায়।

কেবল মরা ধূলোর মরুভূমি

যেদিকে তাকানো যায়, কেবল মরা ধূলোর মরুভূমি। হলুদ, তপ্ত ধু-ধু বালি ছড়িয়ে আছে দিগন্তের শেষ পর্যন্ত—জলহীন, জনহীন, প্রাণহীন : যে-কালো শ্যামলতা তাঁরা ছাড়িয়ে এলেন, তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই-কিছুতেই ভাবা যায় না, সবুজের ঐ উদ্দাম বন্যার পর এই রুক্ষ লাল দিগন্তজোড়া পিপাসা থাকে কী করে।

ভয়ানক এক দুশ্চিন্তা আঁকড়ে ধরেছে ফার্গুসনকে। বেলুনে যে জল আছে, তাতে আর বেশি সময় চলবে না। অথচ কাছাকাছি কোথাও পানীয় জল পাবার সম্ভাবনা নেই। ফার্গুসন দস্তুরমতো ভয় পেলেন, চুল্লিকে সবসময় জ্বালিয়ে রাখার জন্যে পানীয় জল আরো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের অনেক ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো বেলুনকে, যাতে চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সন্ধে নাগাদ প্রায় নব্বই মাইল পাড়ি দেয়া হলো : জানজিবার থেকে এখন তারা মোট প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে এসে পৌঁছেছেন।

দুরবিন চোখে দিয়ে বৃথাই জলের খোঁজে চারদিক নিরীক্ষণ করলেন ফার্গুসন, কিন্তু মরুভূমির মরা ধুলোর রুক্ষ তাপ ছাড়া আব-কিছুই দেখা গেলো না কোনোদিকে। বিষম এক অবসাদ আর হতাশা এসে আচ্ছন্ন করলো তাকে, কিন্তু মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না। কী ভীষণ দায়িত্ব তার উপর! প্রায় জোর করেই তিনি এই দুটি প্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এখন যদি জলাভাব হয়, আর তার ফলে যদি...ফার্গুসন আরকিছু ভাবার চেষ্টা করলেন না। যেদিকে চোখ যায় শুধু বালি আর কাঁটাঝোপ; হলুদ লোলুপ,

লেলিহান মরুভূমির দেশে প্রবেশ করেছে এবার বেলুন-শুধু নির্জলা প্রান্তর পড়ে আছে। হাওয়া নেই বললেই চলে।

ভীষণ এক স্তব্ধতার ভিতর রাত কাটলো, একবারও দুচোখের পাতা এক করতে পারলেন না ফার্গুসন যদি হাওয়া থাকতো প্রবল, তাহলে ভরসা পাওয়া যেতো চট করে হয়তো মরুভূমির এলাকা পেরিয়ে যেতে পারতো বেলুন। সকাল এলো, কিন্তু তবুও আকাশ নির্মেঘ, আর অসহ্য গুমোট, সব বাতাস যেন মরে গিয়েছে। ফাওঁসন হতাশায় ভরে গেলেন। গত দশদিনে আমরা মাত্র অর্ধেক পথ এসেছি, কিন্তু এখন যেভাবে বেলুন যাচ্ছে, তাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে কত সময় যে লাগবে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। তার ওপর জল আবার ফুরিয়ে আসছে।

নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও জল পাবো, কেনেডি বন্ধুকে ভরসা দেবার চেষ্টা করলেন, কোনো-না-কোনো নদী কিংবা জলাশয় নিশ্চয়ই পথে পড়বে।

আমিও তো সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছি। ঈশ্বর করুন, তা-ই যেন হয়!

মিলিয়ে গেছে সমস্ত বাড়ি-ঘর-গ্রাম, জনপদের শেষ চিহ্নটুকু। সর্বনেশে মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বেলুন, দিগন্তের অন্তরাল নেই, কেবল হলুদ বালিকে ঘিরে আকাশের বিরাট বন্ধনী পড়ে আছে। অল্পই জল রয়েছে বেলুনে, পিপাসা মেটাবার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের মুখে-চোখে আতঙ্কের কালো ছায়া ফুটে উঠলো।

যতক্ষণ ফেরার উপায় ছিলো কিছুই বোঝা যায়নি যে এমন হবে। এখন আর পেছনে ফেরার উপায় নেই-শুধু মৃদু বাতাস সামনের দিকে ধীরে-ধীরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক

হয় যদি ঝড় আসে দৈবাৎ, আর উলটো দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় বেলুনকে। কিন্তু সেই দুরাশাটুকু করার মতো মনোবলও ছিলো না কারু আগুন ঝরছে। আকাশ থেকে, আগুন আর শুস্কতা-মেঘের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। সারাদিন মাত্র ত্রিশ মাইল পথ গেছে ভিক্টরিয়া। যদি জলের জন্য ভাবনা না-থাকতো, যদি এই উদ্বেগ কি উৎকণ্ঠা তাদের তাড়া না-করতো, তাহলে এইটুকু অগ্রগতিতে মোটেই তারা বিচলিত হতেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি যতিচিহ্নের মতো এই নির্মম সত্য সারাক্ষণ তাদের চেপে থাকলো : আর মাত্র তিন গ্যালন জল আছে।

এক গ্যালন রাখা হলো ৯১ ডিগ্রি গরমের সহ্যাতীত পিপাসা মেটাবার জন্যে, বাকি দুই গ্যালন যাবে চুল্লির গ্যাস বাড়াবার জন্যে; অথচ এই দুই গ্যালনে মাত্র ৪৮০ ঘনফুট গ্যাস তৈরি হবে, অর্থাৎ মাত্র চুয়ান্ন ঘণ্টা পথ চলা যাবে এর সাহায্যে।

পুরো চুয়ান্ন ঘণ্টাও চলা যাবে না, ফার্গুসন বললেন, কেননা রাতে যাওয়া চলবে

-পাছে অন্ধকারে কোনো নদীনালা বা জলাশয় পেরিয়ে চলে যাই। কাজেই বাদবাকি যে-সামান্য সময়টুক আমাদের হাতে আছে, তার মধ্যে যে ভাবেই হোক না কেন জল আমাদের জোগাড় করে নিতেই হবে। এখন থেকে সাবধানে জল খরচ করতে হবে–র্যাশন করে দেয়াই ভালো।

তা-ই ভালো। কেনেডি সায় দিলেন। এই জলেই ফোঁটা-ফোঁটা করে আমাদের তিন দিন চালাতে হবে। তাতে যত কষ্টই হোক, তা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এর মধ্যে নিশ্চয়ই জল পেয়ে যাবো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য জল পান করা হলো—অল্প জল, তৃষ্ণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রাত্রির মতো বেলুন নামলো বিরাট বালুকাময় ভূমিতে। নিটোল, ঝকঝকে, মিটমিট-জ্বলা তারারা ফুটে আছে আকাশে, আলোর ফুলের মতো, কিন্তু সেই সঙ্গে হাওয়া কেবল ছড়িয়ে দিচ্ছে শুষ্কতা। দিনের বেলায় খর রৌদ্রের সহ্যাতীত আঁচ-যেন সব পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।

সকল পাঁচটায় ফের যাত্রা শুরু হলো, কিন্তু ভিক্টরিয়া কিছুতেই আর চলতে চায় —স্থির দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায় : গোটা জগৎ থেকেই যেন বাতাস উবে গিয়েছে, চরাচর পর্যন্ত যেন তৃষ্ণার্ত।

এই-ই হলো আফ্রিকার আসল চেহারা : তৃষ্ণা, তাপ আর হতাশা দিয়ে তিলেতিলে শুকিয়ে মারে। ফার্গুসন আপন মনে বলে উঠলেন।

সন্ধেবেলায় হিশেব করে দেখা গেলো, সারা দিনে মাত্র কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করেছে বেলুন। দিনের বেলায় ঘন নিশ্বাসের মতো একটু উষ্ণ বাতাস তবু থাকে, কিন্তু রাতে তাও মরে যায়। সারা শরীর জ্বলে যেতে চায় শুকনো তাপে, যেন ফোঁসকা পড়ে যাবে।

পরদিন বিকেলে চারটের সময় দিগন্তে কতগুলো পাম গাছ দেখে সবাই চিৎকার করে উঠলো, ঐ তো গাছ দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয় মরূদ্যান আছে, এবার তাহলে জল পাবো

বড্ড গরম! জো শুকনো মুখে বললে, মরূদ্যান যখন পাওয়া গেলো, তখন এবার নিশ্চয়ই একটু জল পাওয়া যেতে পারে!

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

প্রত্যেকে এক পাত্র করে জল পান করলেন। আর মাত্র সাড়ে-তিন পাত্র জল রইলো। এদিকে গরম ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে। আকাশে যদি মেঘও থাকতে একটু, তাহলে হয়তো রোদের খরতা একটু কমতো, কিন্তু মেঘের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও।

ছ-টা নাগাদ পামগাছগুলোর কাছে এলো বেলুন। মরা কতগুলি গাছ নীরক্ত ও শ্বেত কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সব পাতা ঝরে গেছে। গাছগুলির তলায় একটু গহ্বর-মতো দেখা গেলো, হয়তো কোনোকালে কোনো কুয়ো ছিলো এখানে। ইতস্তত চারপাশে ছড়িয়ে আছে কতগুলি পাথর, কিন্তু একফোঁটাও জল নেই কোথাও; পশ্চিম দিকে, অনেক দূর পর্যন্ত, নানা ধরনের কঙ্কাল পড়ে আছে; মড়ার মাথার শাদা খুলি, রাশি-রাশি হাড় আর হাড়। যে-সব হতভাগ্যরা জলের আশায় এখানে এসে প্রাণ হারিয়েছে, সেইসব মানুষ আর প্রাণীর কঙ্কাল মৃত্যুর ঠাণ্ডা শাদা দাঁত-বার-করা টিটকিরির মতো পড়ে আছে। এই মরা গাছগুলি পথ দেখিয়ে এনেছে পিপাসার্তদের, তারপর তারা এখানে এসে অসহ্য তৃষ্ণায় এই হলুদ বালির ওপর পড়ে ধুকতে-ধুকতে আলিঙ্গন করেছে মৃত্যুকে।

বেলুন নামতেই সকলে কুয়োর দিকে গেলেন, তারপর তার গা বেয়ে ধাপে-ধাপে নিচে নেমে গেলেন কেনেডি, পেছনে গেলো জো। কিন্তু সব শুকনো, শুধু বালি আর বালি, হলুদ ধূ-ধূ, তপ্ত। আঙুলগুলি পাগলের মতো খুঁড়ে তুলতে চাইলো জল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অনেক অনেক বছর ধরেই শুকিয়ে মৃত পড়ে আছে এই কুয়ো। সর্বাঙ্গে বালি

মেখে সঙ্গী দু-জন মূর্তিমান হতাশার মতো কুয়ো থেকে বেরিয়ে এলো, ফার্গুসন এক অবর্ণনীয় হতাশায় ভরে গেলেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়া করা হলো নির্জলা। কারু মুখেই কোনো কথা নেই। সেই মৃত. রিক্ত, শ্বেতশুভ্র হাড়গুলি স্পষ্ট গলায় তাদের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছে।

যখন বেলুনকে আকাশে তোলা হলো

পরের দিন—সে-দিন শনিবার—যখন বেলুনকে আকাশে তোলা হলো তখন আর মাত্র দু-ঘণ্টা চলাবার মতো শক্তি আছে ভিক্টরিয়ার। এর ভেতরে যদি কোনো জলাশয় নাপাওয়া যায়, তাহলে মরুভূমির মরা ধূলোয় মরে পড়ে থাকা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। তার সর্বগ্রাসী রিক্ততা নিয়ে পড়ে আছে হলুদ মরুভূমি, এমনকী একটু হাওয়াও সে রাখেনি অভিযাত্রীদের ভরসা দেবার জন্যে। রোদ এত প্রখর যে, সেই সকাল বেলাতেই পারা চড়চড় করে উঠে গেলো একশো তেরো ডিগ্রি পর্যন্ত। ফার্গুসন তাকিয়ে দেখলেন, সঙ্গী দু-জন আচ্ছন্নের মতো চোখ বুঝে পড়ে আছেন। একাই তাঁকে শেষ চেষ্টা করতে হবে বাঁচবার। উদভ্রান্তের মতো তিনি চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে চললেন, বেলুন উঠে এলো পাঁচ হাজার ফিট। কিন্তু নিচে যেমন ওপরেও তেমনি, একটুও হাওয়া নেই। সোজা ওপরে চলে এলো বেলুন মস্ত এক লম্বের মতে, একচুলও এদিক-ওদিক নড়লো না, তারপর একসময়ে সব গ্যাস সংকুচিত হয়ে ফের সেই খাঁ-খাঁ বালিতেই নেমে এলো, যেখান থেকে উঠেছিলো ঠিক সেখানেই।

বেলা তখন দুপুর। এখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে চাড় হ্রদ, আর পশ্চিম উপকূলও প্রায় চারশো মাইল দূরে অবস্থিত।

ধীরে-ধীরে বেলা গড়িয়ে গিয়ে রাত এলো : আজ আর কেউ রাতের বেলায় পাহারা দেবার কথা ভাবলেন না, অথচ কারু চোখেই কিন্তু ঘুম নেই।

পরদিন প্রায় আধপাত্র আন্দাজ জল বাকি থাকলো। ঐ শেষ জলবিন্দুটুকু স্পর্শ করা হবে না বলে ঠিক হলো। আকাশ ঝকঝক করছে, তেমনি নিমেঘ আর অগ্নিক্ষরা।

সন্ধের দিকে জো-র ভিতর পাগলামির লক্ষণ দেখা দিলো। মুঠো মুঠো বালি তুলে সে বলতে লাগলো, আঃ কী ঠাণ্ডা জল। তারপর মুখে পুরেই থুঃ থুঃ করে ফেলে। দিতে লাগলো, নাঃ, বড্ড বেশি নোনা জল–কিছুতেই পান করা যায় না। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে তার—চারদিকের বিস্তীর্ণ বালুকাকে সে বার-বার ভুল করতে লাগলো নীল সমুদ্র বলে।

ফার্গুসন আর কেনেডি পড়ে আছেন অসাড়। হামাগুড়ি দিয়ে জো দোলনার দিকে এগিয়ে গেলো। বোতলের জলের শেষ তলানিটুকু সে পান করবেই, না-হলে যেন এক্ষুনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার হৃৎপিণ্ড! তীব্র ইচ্ছাশক্তির বলে সে অবশ হাত নিয়েই বোতলটাকে কাছে টেনে নিলে, তারপর ঠোঁটের কাছে তুলে ধরতেই কানে শুনলো, আমায় একটু দাও, আমায় একটু!

তাকিয়ে দ্যাখে, কেনেডিও হামাগুড়ি দিয়ে পাশে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোনো কথা না-বলে সে তার হাতে তুলে দিলে বোতলটি মূহূর্তে সবটুকু জল নিঃশেষে গলায় ঢেলে দিলেন কেনেডি। ফ্যাল ফ্যাল করে জ্বালাধরা চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো জো। তারপর দু-জনেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বালির মধ্যে।

কীভাবে যে সেই ভীষণ রাত কাটলো, কেউ তা জানে না। সকালে মনে হলো সারা শরীর যেন দুমড়ে যাচ্ছে, কে যেন শুষে নিচ্ছে শরীরের সমস্ত রক্ত, সব রক্ত নিংড়ে নিয়ে

কেবল খোশার মতো শরীরটা ফেলে দিয়ে যাবে সে। ভীষণ এক প্রেত সে, তীব্র তার চাহিদা, নাম তার পিপাসা—সে-ই সবাইকে ছিবড়ের মতো ফেলে রেখে যাবে, সব রক্ত নিঃশেষে পান করে। জ্ঞান হতেই ওঠবার চেষ্টা করলে জো, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। ফার্গুসন গুটিশুটি মেরে অসাড়ে পড়ে আছেন, কপালে উঠে আসতে চাচ্ছে তাঁর চোখের তারা। কেনেডির অবস্থা আরো ভীষণ : অনবরত মাথা ঝাকিয়ে চলেছেন তিনি, চোখের শাদা অংশটা রক্তের চাপে টকটকে লাল হয়ে গেছে। হাঠাৎ তার চোখ পড়লো দোলনার গায়ে রাখা রাইফেলটার দিকে

অমনি এক অদ্ভুত দীপ্তিতে মুহূর্তের জন্যে সারা মুখ ভরে গেলো তার, চকচক করে উঠলো চোখের তারা। অমানুষিক প্রচেষ্টায় তিনি এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে নলটা ঢুকিয়ে দিলেন। এবার ঘোড়ায় চাপ দিয়ে তিনি তার জীবনের শেষ শিকার সমাধা করবেন। ট্রিগারের উপর তার শিথিল আঙুল এসে পড়লো।

ও কী করছেন, থামুন! থামুন! থামুন! বলে কেনেডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জো। রাইফেলটা নিয়ে প্রবল ঝুটোপাটি শুরু হয়ে গেলো দু-জনের।

কেনেডি ভীষণ গলায় রুক্ষভাবে শাসিয়ে উঠলেন, সাবধান, জো, যদি ভালো চাও তো শিগগির ছেড়ে দাও, নয়তো তোমাকেই আমি গুলি করে মারবো।

জো কোনো কথা বলেনি

জো কোনো কথা বলেনি। প্রবল হাতে সে ভীষণ আঁকুনি দিলে কেনেডিকে। এক হাতে বন্দুকের ট্রিগার চেপে অন্য হাতে জো-কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন কেনেডি। আর এই প্রচণ্ড টানা-হেঁচড়ার মধ্যে গুলিটা সশব্দে শূন্যের দিকে বেরিয়ে গেলো। শুন্যে মরুভূমির বুকে কোনো প্রতিধ্বনি না-তুলেই বাজ ফাটার আওয়াজ করে শব্দটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো, কিন্তু সেই আওয়াজেই ফার্গুসনের সংবিৎ ফিরে এলো হঠাৎ। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন : ঐ-যে! ঐ-যে! ঐ দ্যাখো!

আচমকা এই চীৎকার শুনে জো আর কেনেডি ধস্তাধস্তি থামিয়ে দিয়ে দিগন্তের দিকে ফিরে তাকালেন। আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে প্রবল এক ঝড় এগিয়ে আসছে। ভীষণবেগে-পাহাড়-উঁচু হয়ে এগিয়ে আসছে মস্ত এক বালির স্তম্ভ, যেন হঠাৎ নিস্তরঙ্গ কোনো সমুদ্রের সব জলরাশি ফুলে-ফেঁপে ফুশে উঠে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে।

ফার্গুসন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, সাইমুম!

সাইমুম! অর্থ না-বুঝেই বিড়বিড় করে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে জো।

ভালোই হলো! অসহায় ক্ষোভে ভরে গেলেন কেনেডি, মৃত্যুর হাত থেকে আর ত্রাণ নেই! ভালোই তো-আত্মহত্যার চেষ্টা করতে হবে না আর।

সাইমুম একধরনের লু—আরব মরুভূমির যে উত্তপ্ত শুষ্ক ধূলিময় ঝোড়ো বাতাস শ্বাস রোধ করে উদ্দাম বয়ে যায়, তাকেই এই নামে ডাকা হয়। তার ভীষণতা স্বচক্ষে না-

দেখলে বোঝা যায় না। কাজেই কেনেডির ক্ষোভ অসংগত নয়। কিন্তু ফাণ্ডসন অন্য কথা বললেন, না, ডিক, আর আমাদের ভয় নেই, এবারকার মতো আমরা বোধহয় বেঁচে গিয়েছি। এই বলে তিনি দ্রুত হাতে দোলনা থেকে বালি সরিয়ে দিতে লাগলেন। দেখাদেখি কেনেডি আর জো-ও তা-ই করলে, তারপর তিনজনে দোলনায় উঠে বসলেন ঝড় তখন কাছে এগিয়ে এসেছে। উঠে বসতে-না বসতেই ঝোড়ো হাওয়ায় তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে উঠে গেলো বেলুন, আর প্রচণ্ড সেই সাইমুম তার প্রবল ধাক্কায় তীরবেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো।

ঝড় থামলো বেলা তিনটেয়। যেমন আচমকা সে এসেছিলো, তেমনি অকস্মাৎ সে চলে গেলো, যাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে নিচে রেখে গেলো মস্ত এক বালির পাহাড়। আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার নিশ্চল হয়ে আকাশে থরথর করে কাপছে ভিক্টরিয়া। আর, সেই মুহূর্তে, অদূরে দেখা গেলো মস্ত একঝাড় খেজুর গাছ, মনোরম এক মরূদ্যান রচনা করে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

জল! জল! এ-যে নিচে জল! চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ফার্গুসন। বেলুনের ভালভ খুলে দিতে হু-হু করে সব গ্যাস বেরিয়ে গেলো, দ্রুত নিচে নেমে এলো ভিক্টরিয়া। এই চার ঘণ্টায় ঝড় তাদের আড়াইশো মাইল তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

সাবধান কিন্তু! সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যেয়ো। ফার্গুসন হুঁশিয়ারি শোনালেন।

কেনেডি আর জো চট করে লাফিয়ে নিচে নামলেন, ছুটে গেলেন কুয়োর কাছে। ধাপ বেয়ে-বেয়ে নিচে নেমে আকণ্ঠ জল পান করতে লাগলেন। আঃ, কী আরাম। স্নিগ্ধ একটি

সুষমায় দু-জনের সারা শরীর ভরে গেলো। ঈশ্বর করুণাময়, শেষ পর্যন্ত তিনিই তাদের পিপাসাকাতর নিষ্ঠুর মৃত্যু থেকে বাঁচালেন।

আঁজলার পর আঁজলা জল পান করতে লাগলেন কেনেডি, পাগলের মতো।

জো বারণ করলে : একসঙ্গে অত জল খাবেন না, খারাপ হবে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি করুন-মিস্টার ফার্গুসনের জন্যেও তো জল নিয়ে যেতে হবে।

বন্ধুর নাম শুনে কেনেডির সংবিৎ ফিরে এলো। বোতল ভর্তি করে জল নিয়ে ফিরতে যাবেন, এমন সময় কুয়োর মুখটায় হঠাৎ সূর্যালোক আড়াল করে দিলো যেন কে।

এ-কী! আমরা যে আটকা পড়ে গেলাম।

কী সর্বনাশ! সিংহ দেখছি! চীৎকার করে উঠলো জো।

সিংহ নয়, সিংহী, কেনেডি বললেন, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। মুহূর্তে লক্ষ্য স্থির করে তিনি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিলেন। ভীষণ আওয়াজে কুয়োর ভেতরটা ভরে গিয়ে তাদের বধির করে দিলে, আর তারপরেই, কানে তালা লাগিয়ে বিকট আর্তনাদ করে সিংহটা গড়িয়ে কুয়োয় পড়ে গেলো। আর তারই প্রচণ্ড হ্যাচকা আঘাতে টাল সামলাতে না-পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেলো জো। ঠিক এমন সময় অতর্কিত আবার একটি গুলির শব্দ শোনা গেলো। দেখা গেলো, ফার্গুসন এসে দাঁড়িয়েছেন ওপরে, তখনও তার বন্দুক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কেনেডি তাড়াতাড়ি উঠে এসে ফার্গুসনকে জলের বোতল দিলেন। কোনো কথা–বলে তৎক্ষণাৎ ফার্গুসন সব জল ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে গাছতলায় শুয়ে ঘুম দিলেন। তার আগে অবশ্য ভালো করে চারদিক দেখে নেয়া হলো ধারে-কাছে অন্য-কোনো জীবজন্তু আছে কি না। যখন আর-কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখা গেলো না, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই ভীষণ অবসাদের পর গভীর সুপ্তির হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দিলেন। ঘুম খুব ভালো হয়েছিলো, কেননা সকালে বেশ ঝরঝরে লাগলো শরীর, বেশ চাঙা লাগলো।

বিশ্রামেই কাটিয়ে দেয়া হলো সারা দিন। ফার্গুসন স্থির করেছিলেন, অনুকূল বাতাস না-পাওয়া পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম করবেন। কিন্তু তাতেও আবার ভয় আছে। যদি এভাবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তো সব খাবার ফুরিয়ে যাবে, এবং অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হবে। এক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে কিনা আরেক মৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়তে হবে!

পিপেভর্তি জল নেয়া হলো। এখন মোটেই বাতাস নেই বটে, কিন্তু যখনই বাতাস আসে তখনই যাতে রওনা হওয়া যায় তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো।

ক্রমে সন্ধে হলো, তারপরে ধীরে-ধীরে রাত। জো পাহারা দিচ্ছিলো, হঠাৎ সে দেখলো অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করে উঠলো,শিগগির উঠুন শিগগির! বাতাস আসছে-ঐ দেখুন, বাতাস!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন ফার্গুসন আর কেনেডি। মিথ্যে বলেনি জো, সত্যিই ভীষণ ঝড় আসছে। চটপট তিনজনে বেলুনে উঠে বসলেন। একটুও অপেক্ষা করতে হলো না, উঠতে-না-উঠতেই কে যেন বেলুনের ঝুঁটি ধরে ওপরে টেনে নিলে, তারপর—দু-শো ফিট ওপর দিয়ে-ঝড়ের তোড়ে উল্কার মতো ছুটে চললো ভিক্টরিয়া! হাওয়ার গতি এত ভীষণ যে, তিনজনে দোলনার রেলিঙ সজোরে আঁকড়ে ধরে রইলেন, নাহলে এই পুবমুখো ঝড় হয়তো উলটে ফেলে দেবে। জ্যা-মুক্ত ধনুঃশরের মতো ছুটে যাচ্ছে বেলুন, মনে হচ্ছে সে যেন যত তাড়াতাড়ি পারে এই মরুভূমি থেকে পালাতে চাচ্ছে।

সকালবেলার দিকে সামান্য ঘাস দেখা গেলো নিচে, নানারকম গুল্ম, লতা-পাতা, তার পরে আরো-কিছু উদ্ভিদ। ধীরে-ধীরে মরুভূমির একঘেয়ে বালুকাময় বিস্তার অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো, খানিক বাদেই দেখা গেলো কিছু ছোটোখাটো গাছপালা।

কেনেডি বলে উঠলেন, যাক, শেষটায় প্রাণের রাজ্যে এসে পৌঁছুনো গেলো তাহলে?

কই, এখানে তো কোনো জনমানব দেখতে পাচ্ছি না! জো বললে।

ফার্গুসন বললেন, শিগগিরই দেখতে পাবে, কেননা আমরা খুব দ্রুতগতিতে এগুচ্ছি। এখন। মাঝখানে যে-কদিন অনড় গেছে, হাওয়ারা এখন তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিতে চাচ্ছে যেন।

হ্যাঁ। তবে শিগগিরই আমরা আরব-বেদুইনদের দেশে প্রবেশ করবো।

বাতাস অনুকূল ছিলো বলে বেশ ভালো ভাবেই ভেসে যাচ্ছিলো ভিক্টরিয়া। কম্পাস অনুযায়ী বোঝা গেলো বরাবর উত্তর-মুখো যাচ্ছে বেলুন।

অদৃষ্ট তো এখন সুপ্রসন্ন দেখছি, ফার্গুসন বললেন, এভাবে চললে আজকেই আমরা চাড় হ্রদের কাছে পৌঁছুতে পারবো।

চাড হ্রদ হলো মস্ত এক জলাশয়। বর্ষার সময় এর দৈর্ঘ্য হয় একশো কুড়ি মাইল; তবে গ্রীষ্মের খর তাপে কোনো-কোনো জায়গা শুকিয়ে গিয়ে আয়তনে যৎকিঞ্চিৎ ছোটো হয়ে যায়।

শা-কুরু নদীর গতিপথ ধরে চলতে লাগলো বেলুন। কালো বনে ঢাকা দুই তীর, মাঝে-মাঝে দেখা যায় অসংখ্য কুমির নদীর চড়ায় গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে, কোথাও-বা আবার নদীর জলে পিঠ ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছে।

অবশেষে চাড় হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পৌঁছুলো বেলুন। ইয়োরোপে যেমন কাস্পিয়ান সাগর, আফ্রিকায় তেমনি চাড় হ্রদ। এতকাল ধরে লোকে তাকে ভাবতে কোনো অলীক কল্পনা বলে, কেননা অতি দুর্গম এলাকায় তার অবস্থান-জনবসতির বাইরে। প্রতিদিনই এর তীরভূমির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কখনও বাড়ছে কখনও কমছে, আর এর তীরভূমি এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও জলাভূমির দ্বারা আবৃত যে এর মানচিত্র নিখুঁত করে আকা প্রায় অসম্ভব ছিলো।

হ্রদের ভিতর ছোটা-বড়ো দ্বীপ অনেক আছে। এইসব দ্বীপে দুর্ধর্ষ হিংস্র বোম্বেটেরা বাস করে। তারা যখন ভিক্টরিয়াকে দেখলো, তখন ক্রোধে ও কৌতূহলে ফেটে পড়ে ওপর

দিকে বিষের তীর ছুঁড়তে শুরু করে দিলে। বেলুন অবশ্য তাদের তীরের অনে ওপর দিয়েই নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে উড়ে চলে গেলো।

হঠাৎ জো চেঁচিয়ে বললে, ঐ দেখুন, মস্ত সব পাখিরা উড়ে আসছে এদিকে–সংখ্যায়ও নেহাৎ কম নয় তারা, দল বেঁধে আসছে সবাই।

পাখি? কোথায়? ফার্গুসন চোখ ফিরিয়ে দেখলেন কী সর্বনাশ! এই সেরেছে।

কেন? পাখিদের কাছে আবার কোনো ভয়ের কারণ আছে নাকি?

নিশ্চয়ই! ওগুলো ঈগল-কী মস্ত একেকটা, দেখছো! ওরা যদি বেলুন আক্রমণ করে, তাহলে আর রক্ষে নেই আমাদের!

তাতে আর ভয়ের কী! আমাদেরও হাতে বন্দুক রয়েছে।

মিনিট-কয়েকের মধ্যেই ঈগলগুলি বেলুনের কাছে এসে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগলো। অতিকায় সব ঈগল, বোদ পড়ে সোনার মতো ঝকঝক করছে তাদের গা, বাঁকা চোখা নিষ্ঠুর চঞ্চু তার তীক্ষ্ণ ঠোকরে যে-কোনো পোক্ত জিনিশকেও ফুটো করে দিতে পারে। ভয় বলে কিছুই যেন তারা জানে না-রকম-শকম দেখে মনে হলো তারা যেন সব ভীষণ রেগে আছে। ভীষণ ডানা মেলে প্রায় ছো মারার ভঙ্গি করে মুখ বেঁকিয়ে বারেবারে ঘুরে-ফিরে বেলুনের আরোহীদের দেখে যাচ্ছে। ভাবখানা, এরা আবার কে এলো আকাশের স্বত্বে ভাগ বসাতে। দু-একটা তত বন্দুকের পাল্লার ভেতরেই এসে গেলো। কেনেডি তো বন্দুক তাগ করে গুলি করবার জন্যে উশখুশ করতে লাগলেন,

কিন্তু ফার্গুসন নিষেধ করলেন, খামকা ওদের চটিয়ো না, বরং তৈরি হয়ে থাকো। দেখাই যাক না, শেষ অব্দি কী হয়। আমি বললে তবে গুলি ছুঁড়বে। ওরা আহত হলে কিন্তু মারাত্মক হয়ে ওঠে।

কর্কশ কান-ফাটা চীৎকার করে ঈগলগুলি বেলুনকে প্রদক্ষিণ করে চাকার মতো ঘুরতে লাগলো। কয়েকটা পাখি প্রায় তিন ফিট লম্বা। হঠাৎ একটা ঈগল তার বিরাট বাঁকা ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ নখর নিয়ে বেলুনটার দিকে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। অমনি ফার্গুসনের ইঙ্গিতে কেনেডির বন্দুক অগ্নিবর্ষণ করে গর্জে উঠলো। সৌভাগ্যবশত পাখিটার এমন জায়গায় গুলি লেগেছিলো যে সে প্রাণ হারিয়ে কাটা ঘুড়ির মতো পাক খেতে-খেতে মাটির দিকে পড়ে গেলো।

ঈগলেরা একটু ভয় পেয়ে তখনকার মতো দূরে সরে গেলো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ বিক্রমে বেলুনকে আক্রমণ করলে, অনেকে মিলে একসঙ্গে, এবং জো আর কেনেডির বন্দুক গর্জন করে উঠলো : অব্যর্থ একেকজনের টিপ, দুটো পাখি মরে গেলো, ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেলো তারা।

এবারে ঈগলেরা আক্রমণের কৌশল পালটে নিলে। সোজা উঠে গেলো তারা বেলুনের ওপর, তারপরে তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ভীষণ ছোঁ মারলে বেলুনের গায়ে। প্রক্ষণেই দেখা গেলো বেলুন নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

সর্বনাশ! ঈগলগুলো বেলুন ছ্যাঁদা করে ফেলেছে! জো, শিগগির বালির বস্তা কটা ছুঁড়ে ফেলে দাও—ভার না-কমালে বেলুন এক্ষুনি নিচে পড়ে যাবে।

নির্দেশ মতো কাজ করতে একটুও দেরি হলো না। কিন্তু তবুও বেলুন কেবল নেমেই চললো।

তাড়াতাড়ি আরো হালকা করে বেলুন! জলের পিপে ফেলে দাও। কী সর্বনাশ–আমরা যে সোজা হ্রদের দিকে নেমে যাচ্ছি।

জলের পিপে ফেলে দেয়া হলো, কিন্তু বেলুন তবু নামছে। ফার্গুসন সভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ক্রমশ যেন বিশাল জলরাশি বেলুনের দিকে উঠে আসছে। আরো হ্রাস পেলো তার দূরত্ব, আরো, আরো প্রায় দুশো ফিটের মধ্যে নেমে পড়েছে বেলুন। এবারে সব খাবার-দাবার ফেলে দেয়া হলো। বেলুনের নিচের দিকে ধেয়ে আসা খানিকটা কমলো বটে, কিন্তু তবু নিচের দিকেই নেমে চলেছে।আর তবে রক্ষা নেই! শোঁ-শোঁ শব্দ করে সব গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে ছ্যাদা দিয়ে। যখনই তারা পরপর কতগুলি বিপদের হাত থেকে দৈবের অসীম দয়ায় নিষ্কৃতি পেয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন, তখনই কিনা ঈগলগুলি এলো নাছোড় এক অভিসম্পাতের মতো!

আরো-কিছু ফ্যালো! আর কিছু কি নেই ফেলে দেবার মতো? আর তো কিছুই ফেলে দেবার নেই।

কে বলে নেই? এখনও আছে, বলে জো কাউকে কোনো কথা বলার অবসর–দিয়ে চট করে দোলনা থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়লো।

এ কী করলে, জো! এ কী?

কিন্তু জো তখন সেই মস্ত হ্রদের দিকে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো, প্রচণ্ড বেগে নেমে যাচ্ছে। আর তাকে দেখা গেলো না।

এবারে কিন্তু ভিক্টরিয়া অনেক হালকা হয়ে যাওয়ায় ফের আকাশ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে গেলো বেলুন, আর হাওয়া তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো হ্রদের উত্তর তীরের দিকে।

প্রথমটায় কিছুক্ষণ কোনো কথা জোগালো না দুই বন্ধুর মুখে। দু-জনেরই চোখ জলে ভরে ঝাঁপসা হয়ে গেলো। প্রবল এক খেদের ভাব ছেয়ে রইলো দু-জনকে–শোকে তারা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাদেরই বাঁচাবার জন্যে জো কিনা এইভাবে অবধারিত মৃত্যুর দিকে লাফিয়ে পড়লো! ঝাঁপসা চোখে নিচের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখা গেলো না, বেলুন ততক্ষণে অনেক দূরে সরে এসেছে।

শেষে একসময়ে কেনেডি জিগেস করলেন, এখন তাহলে আমরা কী করবো?

যত তাড়াতাড়ি পারি নেমে পড়ে তার জন্যে খোঁজ করবো।

প্রায় ষাট মাইল যাবার পর ভিক্টরিয়া চাড হ্রদের উত্তর তীরে এক জায়গায় এসে মাটি স্পর্শ করলে। নিচু একটি গাছে নোঙার ফেললেন ফার্গুসন।

বেলা গড়িয়ে গেলো—দিগন্তের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাবার পরে কালো একটি রাত্রি নেমে এলো উষ্ণ জঙ্গলের হ্রদের উপর।

সেই রাতে ফার্গুসন বা ডিক—কেউই একবারও চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

হয়তো বেঁচে আছে জো

হয়তো বেঁচে আছে জো। কেননা তার মতো চটপটে, চতুর আর পাকা সাঁতারু নিশ্চয়ই ঐ হ্রদে ডুবে মরবে না। খানিকক্ষণ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুলেন দু-জনে। অন্তত এইভাবেই নিজেদের আশ্বাস দিতে চাচ্ছিলেন তারা। মুখে কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলে কী হবে, মোটেই কোনোরকম ভরসা ছিলো না কারু। বাঁচলে তারা সুখী হন, এইজন্যেই এটা তারা মনে-মনে ভেবে নিলেন। অনেকটা ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্নের মতো। যা হলে ভালো হবে, যা হলে বিবেক একটু সান্ত্বনা পায়, তাই তারা ভাবলেন। সত্য নিষ্ঠুর বলে অনেক সময়েই মানুষ তার দিকে চোখ বুঝে এক অলীক স্বর্ণ বানিয়ে নেয়। কিন্তু সে বেঁচে আছে এই ভেবে তো আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না, তন্নতন্ন করে চারদিকে অনুসন্ধান করতে হবে। দৈব দয়া করলে হয়তো ফিরেও পাবেন জো-কে। কিন্তু তাকে খুঁজতে বেরুবার আগে আরেকটি জরুরি কাজ সাঙ্গ করতে হবে তাদের। দুটি বেলুনের মধ্যে যেটি বাইরে ছিলো, ঈগলদের দুর্বিনীত হিংস্রতার চিহ্ন স্বরূপ সেটির নানা স্থানে কতগুলি ছিদ্র হয়ে গেছে। ওটাকে খুলে ফেলতে হবে প্রথমে, তাহলে অন্তত সাড়ে ছ-শো পাউণ্ড হালকা হবে বেলুন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হ্রদের তীরে একটু ঘুরে দেখে-শুনে এলেন দুজনে, তারপর কাজে লেগে গেলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার গলদঘর্ম পরিশ্রমের পর বেলুনের বাইরের ঢাকাটা খোলা গেলো। বাইরের খোলটা না-থাকায় অবশ্য বেলুনটির ভেসে-থাকার ক্ষমতা পাঁচভাগের এক ভাগ কমে গেলো, কিন্তু তা নিয়ে এখন আর আপশোশ করে কোনো লাভ নেই, কেননা ঐ অকেজো সাড়ে ছ-শো পাউণ্ড বেলুনে রেখে তাকে অক্ষম করে রাখার চাইতে এটা তবু কিছুটা মন্দের ভালো হলো। কেনেডি একবার প্রশ্ন

করেছিলেন, এর ফলে সবাইকে নিয়ে বেলুনটা উড়তে পারবে তো? ফার্গুসন তার জবাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। জিনিশপত্র সব আমি এমনভাবে উলটেপালটে সাজিয়ে নেবো যে জো ফিরে এলেও আমরা সবাই একসঙ্গে উড়তে পারবো।

বেলুনের বাইরের খোলটা খুলে ফেলার পর ফার্গুসনের পরামর্শমতো কেনেডি বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন। অভিপ্রায় : যদি কোনো শিকার মেলে। যাবার আগে ফার্গুসন তাক বারেবারে বারণ করে দিলেন বেশি দূরে যেয়ো না কিন্তু। এ-জায়গা সম্বন্ধে আমার কোনোই আন্দাজ নেই। কখন কী হয়, তার কিছুই ঠিক নেই।

কেনেডি শিকারে বেরিয়ে যাবার পর ফার্গুসন একাই বেলুনের সব জিনিশপত্র নতুন করে সাজালেন। জো-র ওজন অনুযায়ী দোলনায় কিছু নুড়ি-পাথরও তোলা হলো, যাতে বেলুনের ভারসাম্য বজায় থাকে। এইসব করতে-করতেই বেলা গেলো। একসময় কেনেডি ফিরে এলেন! কতগুলি বুনো হাঁস আর নানা ধরনের পাখি মেরে এনেছেন ছররা-গুলি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলিকে রোস্ট করে ভবিষ্যতের খাদ্য হিশেবে তুলে রাখা হলো।

এইসব করতে-করতে সেই দিনটা কেটে গিয়ে রাত করে এলো। খাওয়া-দাওয়ার পর পালা করে দু-জনে ঘুমিয়ে নিলেন। শরীর যদি চাঙা ও সক্ষম না-থাকে, তাহলে কোনো কাজই হবে না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দু-জনে পরামর্শ করতে বসলেন, কী করে জোর তল্লাশ করা যায়। অন্তত জো-কে এটুকু তো জানানো উচিত, তারা কোথায় আছেন। কিন্তু জো যে কোথায় আছে, তা না-জানলে সে-খবর তার কাছে পৌঁছে দেয়া যায় কী করে? শেষটায় ফাণ্ডসন বললেন, বড় অসহায় আমরা, ডিক। দৈবের হাতে সব সমর্পণ করে দেয়া ছাড়া প্রায় কিছুই আমাদের করার নেই। তবে—এখন তো বাতাস ফের উলটো দিকে বইছে। আমরা ইচ্ছে করলে ফের হ্রদের দিকে যেতে পারি। তাই করি বরং, কী বলো? তাতে অনুসন্ধানেরও সুবিধে হবে-তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে জো কোথায় আছে তা পথেই আমাদের নজরে পড়ে গেলো?

এটা ফার্গুসন নিশ্চিত করে জানতেন যে, কোনো বিপদে না-পড়ে থাকলে জো এসে তাদের দেখা দেবেই। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে জংলিরা তাকে বন্দী করে রেখেছে। এমন অবস্থায় আকাশে বেলুন দেখে সে হয়তো একটু আশ্বস্ত হবে। একটি তথ্য ফার্গুসন জানতেন, সেটাই এখন তাঁর সৌভাগ্য বলে মনে হলো : এই অঞ্চলের জংলিরা বন্দীকে নাকি উন্মুক্ত স্থানে বেঁধে রাখে। তার সব ধারণা তিনি বন্ধুর কাছে খুলে বললেন। দু-জনেই তক্ষুনি রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

নোঙর খুলে আকাশে তোলা হলো ভিক্টরিয়াকে, অমনি বিপরীত হাওয়ায় প্রায় কুড়ি মাইল বেগে হ্রদের ভেতর দিকে চলতে লাগলো বেলুন। ফার্গুসন তাপ নিয়ন্ত্রণ করে বেলুনকে দুশো থেকে পাঁচশো ফিট উচ্চতায় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেনেডি মাঝে-মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন বন্দুক দিয়ে; যদি কোনোরকমে সেআওয়াজ জো-র কানে গিয়ে পোঁছোয়, তাহলে সে হয়তো সাড়া দিতে পারবে-অন্তত সাড়া দিক বা না-দিক, তাদের অবস্থান বুঝতে পারবে।

জো যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলো সে-জায়গা অতিক্রম করে গেলেন তারা, কিন্তু জো-র কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। কেনেডি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন। ফার্গুসনও যে হতাশ হননি তা নয়, কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ না-করে বন্ধুকে তিনি আশা দিলেন, অত তাড়াতাড়ি মুষড়ে পড়ো কেন? অমন হুতুশে স্বভাব ভালো না। একটু ধৈর্য ধরে থাকো—এত সহজে হতাশ হলে চলে না।

বেলা যখন প্রায় এগারোটা বাজে, তখন ফার্গুসন হিশেব করে দেখলেন যে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা প্রায় নব্বই মাইল অতিক্রম করেছেন। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই অতর্কিতে আবার আরেক বিপদ। আচমকা প্রায় সমকোণের মতো করে হাওয়ার গতি ঘুরে গেলো। ফার্গুসন বিচলিত হয়ে পড়লেন। এভাবে গেলে আবার তাহলে সেই ভীষণ মরুভূমির খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে। উঁহু, সেদিকে আরকিছুতেই যাওয়া চলবে না। যে-করেই হোক হ্রদের আশপাশেই থাকতে হবে তাদের। অনুকূল বাতাসের আশায় বেলুনকে অনেক ওপরে তুলে নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি

অবশেষে অনেকটা ওপরে ওঠবার পর উত্তর-পশ্চিম এক হাওয়ার স্তর পাওয়া গেলো; সেই হাওয়া তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো গত রাতে তারা যেখানে ছিলেন সেইদিকে। শেষে একসময়ে যথারীতি তীরভূমি দেখা দিলে, বেলুন নিচে নামিয়ে সেখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হলো।

সকালবেলায় আচমকা হাওয়া এমন প্রবল হয়ে উঠলো যে নোঙরের বাধা নামেনে বেলুন প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগলো। বেশ বোঝা গেলো যে এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। শিগগির দু-জনে বেলুনে উঠে পড়লেন।

কেনেডি অবশ্য একটু আপত্তি তুলেছিলেন, এভাবে আমরা চলে গেলে জোর কী হবে? .

ওকে আমরা নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবো না, ডিক। কিন্তু এখানে থাকলে কারুই কোনো উপকার হবে না, মাঝখান থেকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা হবে। বেলুনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর তাহলে জো-কে উদ্ধার করবার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেটা নিই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিন্তু যাওয়ার আগে এক মুশকিলে পড়তে হলো। নোঙরটা মাটির ভিতর এতটা সেঁধিয়ে গিয়েছিলো যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তাকে টেনে তোলা গেলো না। শেষকালে কোনো উপায় না-দেখে ফার্গুসন নোঙরের দড়ি কেটে দিতে বাধ্য হলেন। যেই দড়ি কেটে দেয়া হলো, অমনি তড়াক করে প্রায় তিনশো ফিট ওপরে উঠে গেলো বেলুন, সোজা চললো উত্তরমুখো, তীরের মতো। এই প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। স্তব্ধ হয়ে রইলেন ফার্গুসন, বিষণ্ণ। ক্রমেই বেলুন একটু একটু করে তার সব ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফেলে দেয়া হয়েছে জলের পিপে ও অন্য অনেক সরঞ্জাম, তার বাইরের খোলটাও চলে গেছে, এখন গেলো তার নোঙর। আর, শুধু তা-ই নয়, সর্বোপরি, তার এতকালের এত অভিযানের সঙ্গী প্রিয় ভৃত্য জো-ও কিনা সঙ্গে নেই-হয়েতো তাকেও চিরকালের মতো হারাতে হলো। এ-কথা

ভাবতে ফার্গুসনের বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। অসীম নীলিমার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি উদগত অশ্রুকে গোপন করলেন।

কাঁটাঝোপ আর বন্য গুল্ম-ভরা সুদান সীমান্তের টিবাউস মরুভূমি অঞ্চল পেরিয়ে এলো ভিক্টরিয়া। শোঁ-শোঁ করে বেলুন তিন ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল পথ পেরিয়ে এলো। নোঙর নেই বলে এখন বেলুনের ওপর কোনো কর্তৃত্বও নেই আরোহীদের। ফাণ্ডসন দেখলেন তাঁর নিজের হাতে গড়া জিনিশ এখন আর তার ইচ্ছেকে সম্মান করে না। এমন বিপদ, যে নামাও যাচ্ছে না, থামাতেও পারছেন না। এমনকী কোনো গাছ বা টিলাও নজরে পড়ছে না যে কোনোরকমে তার গায়ে গিয়ে বেলুন ঠেকবে। এমনিভাবে যদি খানিকক্ষণ চলে তো সাহারা মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছোত হবে তাদের। সাহারার কথা ভাবতেই ফার্গুসনের শরীর শিউরে উঠলো। ঈশ্বর করুন কিছুতেই যাতে সাহারায় গিয়ে না-পৌঁছুতে হয়—একবার সাহারার পাল্লায় পড়লেই সব আশা শেষ হয়ে যাবে।

এদিকে ঝড়ের গতিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রবল ঘূর্ণি হাওয়ার প্রচণ্ড দাপটে ভয়ানকভাবে দুলতে লাগলো বেলুনের দোলনা-আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে অসহায় আরোহী দু-জন রেলিঙ আঁকড়ে নিরুপায়ভাবে বসে রইলেন। আর, এমনভাবে কতক্ষণ চলবার পর, আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বেলুন, সব হাওয়া মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই এলো আরেক ঝোড়ো হাওয়া, এবারে উলটো দিক থেকে। যেমন প্রচণ্ড গতিতে এতক্ষণ তাদের তাড়িয়ে এনেছিলো, তেমনি প্রচণ্ডভাবে আবার বেলুনকে আগের জায়গায় টেনে নিয়ে চললো। বাতাস যেন নতুন খেলনা পেয়েছে তার হাতে, তাই তাকে নিয়ে বাচ্চাদের মতো লোফালুফি খেলছে এখন।

এ আবার কোথায় চলেছি?

ঈশ্বরের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখো, ডিক। আবার দক্ষিণ দিকেই চলেছি আমরা। এতক্ষণ আমি সেদিকেই যেতে চাচ্ছিলুম। হয়তো শেষ অব্দি আমরা বরনু এলাকার কুকা শহরে গিয়ে পৌঁছুবো।

মনে হচ্ছে ঝড় শিগগিরই কমে যাবে। আকাশ তো বেশ পরিষ্কার হয়ে এলো।

ভালোই তো। দুরবিন নিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো চারদিকে—কোনকিছুই যেন আমাদের নজর এড়িয়ে চলে যেতে না-পারে।

দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখে

দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখে হঠাৎ একসময়ে কেনেডি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে! ঐযে, দূরে, কতগুলো ঘোড়সোয়ার ছুটে চলেছে বলে মনে হচ্ছে! অবশ্য ভীষণ ধূলো উড়ছে, তাই ভালো করে সঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফার্গুসন সেদিকে দুরবিন ঘুরিয়ে নিলেন : ঘোড়সোয়ার বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে অনেক দূরে রয়েছে বলে ঠিকঠাক চেনা যাচ্ছে না, কেবল কালো কতগুলো চলন্ত ফুটকিই চোখে পড়ছে।

আমি নজর রাখছি। খুব অবাক লাগছে আমার। হয়তো কোনো অশ্বারোহী সেনাবাহিনী চলেছে।

তোমার আন্দাজই সম্ভবত ঠিক। ওরা নির্ঘাৎ কোনো আরব ঘোড়সোয়ার বাহিনী। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, ওরাও সেই দিকেই যাচ্ছে। অবশ্য ওদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি যাচ্ছে আমাদের বেলুন, কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুবো। তখন না-হয় ভেবে দেখা যাবে, আমাদের কী করা উচিত।

ঠিকই ধরেছো তুমি। কেনেডি কিছুক্ষণ ভালো ভাবে দেখে নিয়ে বললেন, আরব সওয়ারদের বাহিনী বলেই মনে হচ্ছে! কী জোরে ছুটছে, দেখেছো? ঠিক তীরের মতো। জনা-পঞ্চাশেক হবে সংখ্যায়। সার বেঁধে চলেছে সবাই মিলে। দলের সর্দারটি প্রায় শো-খানেক গজ আগে-আগে যাচ্ছে।

ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দরকার বুঝলে এখানেই বেলুন নামাবার ব্যবস্থা করবো। তুমি কী বলে?

ভারি আশ্চর্য তো? কেনেডি দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখেই বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, বড়ো অদ্ভুত লাগছে আমার—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওদের গতিবেগ, চলার ভঙ্গি আর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তো নেহাৎ সাধারণ কোনো রুটিন কুচকাওয়াজ বলে মনে হচ্ছে না। এ যেন কাউকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে ওরা। ফার্গুসন, আমার কিন্তু কী রকম লাগছে! আরো স্পষ্ট না-দেখে বেলুন নামানো বোধহয় উচিত হবে না।

তুমি ঠিক দেখেছো তো?

নিশ্চয়ই! উঁহু, ফার্গুসন, আমার আন্দাজ মোটেই ভুল হয়নি। সত্যিই কাউকে ভীষণভাবে তাড়া করে যাচ্ছে ওরা। সামনের ঐ লোকটা সর্দার নয়—ওকেই ধরবার জন্যে ছুটেছে। ক্রমেই তার সঙ্গে ওদর দূরত্ব কমে আসছে। একজন লোককে ধরবার জন্যে আস্ত একটা বাহিনী! কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না তো! সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে! খুব রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে!

বেলুন আরো কাছে এগিয়ে এলো। প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে ঘোড়সোয়ারেরা।

হঠাৎ কেনেডি বিস্ময়ের স্বরে চীৎকার করে উঠলেন, ফার্গুসন! এ কী দেখছি।

বন্ধুর গলার স্বর শুনে ফার্গুসন আঁৎকে উঠলেন। কী? কী হলো?

এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? কী ব্যাপার?

এ-যে জো! দুরবিনে স্থির দৃষ্টি রেখে কেনেডি বলে উঠলেন, জো-কেই এই আরবরা তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে! ক্রমেই ব্যবধান কমে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে!

দেখি! দেখি! বলে ফার্গুসন দুরবিন তুলে নিলেন।

আরে! সত্যিই তো!

ও আমাদের দেখতে পায়নি।

এক্ষুনি আমি সব ব্যবস্থা করছি। এই বলে ফার্গুসন চুল্লির আগুন কমিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ওর ঠিক মাথার ওপর গিয়ে পৌঁছে যাবো।

বেলুন ক্রমে নিচে নেমে আসছে। আরব-বেদুইনদের বেলেল্লা চীৎকার শোনা যাচ্ছে। বেলুন থেকে। বিকট গলায় চাচাতোচাতে জোর পশ্চাদ্ধাবন করছে তারা, তাদের পিছনে যে বেলুন এসে গেছে তা তাদের নজরে পড়েনি। প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে ভিক্টরিয়া।

আমি বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করছি, কেনেডি বললেন, তাহলেই ও ফিরে তাকিয়ে আমাদের দেখতে পাবে।

আরবদের সঙ্গে জো-র দুরত্ব আরো অনেক কমে গিয়েছে। ছুটতে ছুটতেই একজন আরব তাকে লক্ষ্য করে বল্লম উঁচোলো। কেনেডি আর দেরি করলেন না। তক্ষুনি তার অবার্থ নিশানায় গুলি ছুঁড়লেন; পলকের মধ্যে আরবটি ঘোড়া থেকে ছিটকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলো। জো কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ শুনেও ফিরে তাকালো না, কোনো দৃকপাত না-করেই সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলো।

কেনেডির বন্দুক অবশ্য আরেকবার অগ্নিবর্ষণ করলো। আরেকজন আরব ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো, আর কয়েকজন আবার হঠাৎ থেমে গিয়ে চটপট মাটিতে নেমে পড়লো- বোধকরি সঙ্গীদের অবস্থা দেখার জন্যে : বাকিরা কোনো দিকে দৃপাত নাকরে সোজা জো-র পেছন পেছন ছুটে গেলো। ব্যাপার কী বলো তো? জো থামছে না কেন?

না-থেমে ভালোই করেছে। ঠিক বেলুনের গতিপথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে ও, নিশ্চয়ই আমাদের ভরসাতেই আছে। শাবাশ জোর দ্যাখোনা, আমি গিয়ে ওকে একেবারে আরবদের নাকের ডগা থেকে তুলে নিয়ে আসবে। আমরা আর অল্পই পেছনে আছি। একটু সবুর।

কিন্তু এই সময়টুকু আমরা কী করবো?

তুমি বরং বন্দুকটা রেখে দিয়ে এক কাজ করো।পাউণ্ড-পঞ্চাশেক ওজনের একটা কোনো বস্ত্র তুলে ধরতে পারবে তুমি?

নিশ্চয়ই। তার চেয়ে ঢের বেশি ওজন তুলতে পারি আমি।

ঠিক আছে। ফাণ্ডসন একটা পাথর-ভরা বস্ত তুলে দিলেন কেনেডির হাতে। এটা নিয়ে তুমি তৈরি হয়ে থাকো। যেই আমি ইঙ্গিত করবে, অমনি ওটাকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, আমার নির্দেশ না-পাওয়া অব্দি কিছুতেই ফেলে না

যেন তাহলে মুশকিল হবে।

ঠিক আছে। তুমি যেমন বলবে, তা-ই হবে। ভিক্টরিয়া ততক্ষণে আরব ঘোড়সায়ারদের মাথার ওপর এসে পড়েছে। ফার্গুসন দোলনার সামনের দিকে এসে দাঁড়ালেন, হাতে তার দড়ির মই, সময়মতো ওটাকে ছুঁড়ে দেবেন জো-র কাছে। জো তখন আরবদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে, পুরো কদমে তার ঘোড়া ছুটছে। ধুলো উড়িয়ে, তুমুল টগবগ আওয়াজ করে। ভিক্টরিয়া আরব বেদুইনদের ছাড়িয়ে চলে এলো।

ফার্গুসন তার বন্ধুকে জিগেস করলেন, তৈরি তো?

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

জো! জো! ওপরে তাকিয়ে দ্যাখো, এই বলে গলার জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ফার্গুসন, সেইসঙ্গে দড়ির মইটা তিনি ফেলে দিলেন নিচে, মাটি পর্যন্ত নেমে গেলো সেটা।

ফার্গুসনের গলা শুনে ঘোড়ার গতি না-থামিয়েই পেছন দিকে ফিরে তাকিয়েছিলো জো। দড়ির মইটা কাছে আসতেই চক্ষের পলকে সেটা ধরে সে ঝুলে পড়লো, আর তেমনি

ফার্গুসনের নির্দেশ অনুযায়ী পাথরভরা বস্তাটা কেনেডি ফেলে দিলেন। ভার কমে ওয়ায় তৎক্ষণাৎ এক ঝটকায় প্রায় দেড়শো ফিট ওপরে উঠে গেলো ভিক্টরিয়া।

কঠিন, আঁটো হাতে দড়ির মই ধরে ঝুলে রইলো জো। ঝাঁকুনিতে তখন সেটা ভীষণভাবে দুলছিলো, একটু যদি ফসকে যায় বা কোনোরকমে মুঠো আলগা হয়ে যায়, তাহলে,আর রক্ষে নেই। শ্বাস রোধ করে জোর কাণ্ড দেখতে লাগলেন তাঁরা। জোর কপালের শিরাগুলি তখন রক্তচাপে প্রবলভাবে ফুলে উঠেছে, অস্বাভাবিক এক দীপ্তিতে তার চোখ জ্বলে উঠেছে, ক্রমশ যেন ইন্দ্রিয়গুলির ওপর থেকে সে অধিকার হারিয়ে ফেলছে। আর তারই সঙ্গে মানিয়েই যেন নিচের আরবদের চঁচামেচিতে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না, এমনকী হাওয়ার শব্দও তার কানে পৌঁছুচ্ছিলো না। সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কৌশলে তরতর করে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই দোলনায় উঠে এলো।

দোলনায় পা দিতেই দুই বন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরলেন। নিচে বেদুইনদের ক্রুদ্ধ শোরগোল তখন চরমে পৌঁছেছে, কিন্তু বেলুন যত দূরে সরে যেতে লাগলো–সেই আওয়াজও একটু-একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

প্রভু! মিস্টার কেনেডি! কেবল এই দুটি কথা বলেই জো অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তার শরীরে আর একটুও ক্ষমতা ছিলো না। আফ্রিকার উষ্ণ শুকনো হাওয়া সব যেন শুষে নিয়েছে। উত্তেজনা আর অবসাদ যেন পাকে-পাকে পেঁচিয়ে ধরছে তাকে। শরীরের নানা জায়গায় ছোটো-বড়ো কত যে ক্ষত। সে-সব থেকে রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। ফার্গুসন তাড়াতাড়ি তাতে নানারকম ওষুধ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলেন। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলো জো-র, মিনমিনে গলায় সে জল খেতে চাইলো। ঢকঢক কবে বোতন, ভর্তি জল

নিঃশেষ খেয়ে সে অবসাদ আর ক্লান্তির ফলে ঘুমিয়ে পড়লো। বেলুন তখন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার পশ্চিমভাগে। সেখানে, নীলগিরি পর্বতমালার একেবারে দুর্ভেদ্যগভীরে উঠেছে এক মস্ত চূড়া—যার নাম গ্রেট আইরি-ঈগলপাখির মস্ত বাসা। তার বিশাল বর্তুল আকৃতিটা কাটাওয়াবা নদীর তীরে ছোট্ট-যে শহর আছে, মরগ্যানটন নাম, সেখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে। আরো স্পষ্ট চোখে পড়ে যখন কেউ প্লেজেন্ট গার্ডেন গ্রামটার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলে যায়।

আশপাশের অঞ্চলের লোকে কেন-যে এই পাহাড়চূড়ার নাম দিয়েছিলো গ্রেট আইরি-ঈগলপাখির মস্ত বাসা—তা আমি এখনও জানি না। পাহাড়টা উঠে গেছে পাথুরে, রুগম্ভীর, অগম্য, আর বিশেষ-বিশেষ আবহাওয়ায় তার গায়ে জড়িয়ে থাকে এক গভীরনীল ও অদ্ভুত-সুদূর ভঙ্গি। তবে নামটা শুনে প্রথমেই যে-ভাবনাটা লোকের মাথায় খেলে যাবে, তা হলো নিশ্চয়ই এখানটায় শিকারি পাখিরা এসে বাসা বাঁধে, আস্তানা গাড়ে, তা-ই এই নাম : ঈগল, কর, গৃধিনী; অগুনতি পালকখচিত পাখনাওলা জীবের বসতি, মানুষের নাগালের বাইরে এই দূর-চূড়ার উপর ডুকরে ডেকে-উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে তারা। অথচ, এদিকে কিন্তু, এই গ্রেট আইরি পাখিদের যে খুব-একটা আকৃষ্ট করে তা অবশ্য মনে হয় না; বরং তার উলটোটাই সত্যি; আশপাশের এলাকার লোকজন মাঝেমাঝে উলটে বরং এই মন্তব্যই করে যে পাখিরা চুড়োটার দিকে যখন উড়ে যায়, তখন আচমকা দ্রুতগতিতে উঠে যায় আরো-উপরে, চক্কর দেয় শিখরটার ওপর, পাক খায়, তারপর ক্ষিপ্রবেগে দূরে উড়ে যায়, আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে দেয় তাদের কর্কশ চীৎকারে।

তাহলে কেন শিখরটার নাম গ্রেট আইরি? তার চেয়ে বরং শিখরটার নাম জ্বালামুখ দিলেই মানাতো বেশি, কারণ এই খাড়া সটান-ওঠা বর্তুল দেয়ালগুলোর মধ্যে হয়তো গভীর-কোনো নয়ানজুলিই আছে। হয়তো ঐ দেয়ালগুলো আড়াল করে রেখেছে কোনো মস্ত পাহাড়ি ঝিল, যেমনটা প্রায়ই দেখা যায় আপালাচিয়ার পর্বতব্যবস্থার অন্যান্য অংশে, এমন-এক লেগুন যাকে অনবরত জল খাইয়ে যায় বৃষ্টিবাদল আর শীতের তুষার।

এককথায়, এটা কি তবে কোনো প্রাচীন আগ্নেয়গিরিরই আবাস ছিলো না-যে–আগুনের পাহাড় অনেক বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে সত্যি,তবে যার আভ্যন্তর স্তিমিত আগুন আবার যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে না, তা-ই বা কে জানে? গ্রেট আইরি কি একদিন আশপাশে সেই বিষম দুর্বিপাকই সৃষ্টি করবে না, যে-দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে মাউন্ট ক্রাকাতোয়া কিংবা মাউন্ট পেলে? সত্যি যদি তার মাঝখানে গভীর-কোনো হ্রদ থেকে থাকে, তবে সেই জলের মধ্যে কি সর্বনাশই ওতপ্রোত মিশে নেই, যা একদিন হয়তো পাথুরে স্তরগুলোর ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে গিয়ে পড়বে গভীর নিচে, আর আগ্নেয়গিরির আগুনের কুণ্ডে পড়ে বাষ্প হয়ে পাক খাবে, আর পাথর ফাটিয়ে বার করে নেবে তাদের বাইরে বেরুবার পথ, ভয়ংকর বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে চারপাশ, গলন্ত লাভার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ক্যারোলাইনার সুন্দর উপত্যকাদেশ, যেমনটা ঘটেছে এই সেদিন, ১৯০২ তে, মার্তিনিক-এ?

সত্যি-বলতে, এই শেষ সম্ভাবনাটা যে মোটেই কোনো অলীক বা অমূলক আশঙ্কা পশ্চিমমুখে উড়ে চলেছে। পথে যখন এক স্থানে রাত্রিবাসের জন্যে বেলুন থামানো হলো, জো তখনও মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে বেলুন তখন

সুদানের দক্ষিণ সীমান্তে জিণ্ডা শহরের–জিণ্ডার এখনকার নাম নাইজেরিয়া—কাছে। এসে পৌঁছুলো, জো জেগে উঠলো।

ঘুম থেকে উঠে প্রথমটায় সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, যেন তার উপলব্ধির সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে, কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না আর। আস্তেআস্তে অবশ্য তার চোখের দীপ্তি সহজ হয়ে এলো। ফার্গুসন তার হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন : নিজের জীবন তুচ্ছ করে তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছো, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো, আমি তার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না।

জো এ-কথা শুনে একটু যেন লজ্জিত হলো আত্মপ্রশংসায় কান না-দিয়ে বললে, অমন কথা বলবেন না! ওভাবে তখন যদি ঝাঁপিয়ে না-পড়তুম, তাহলে সবাই মিলে মরতুম। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি কেবল আপনাদেরই বাঁচাইনি, নিজেকেও বাঁচিয়েছি। আত্মরক্ষার জন্যেই আমি ও-কাজ করেছিলুম।

তারপর সে ধীরে-ধীরে তার কাহিনী খুলে বললে। চাড হ্রদে পড়ে কিছুদূর সাঁৎরে যাবার পর এক বিস্তৃত জলাভূমির মধ্যে এসে পড়ে সে; সেখানে হঠাৎ একটা দড়ি দেখে সে অবাক হয়, দড়ি ধরে তক্ষনি সে তীরে চলে আসে। তীরে এসে দ্যাখে দড়ির শেষ প্রান্ত মাটিতে তাদেরই বেলুনের নোঙর পোঁতা আছে। তা-ই দেখেই সে মোটামুটি একটা আঁচ করে নেয় বেলুন কোন দিকে গেছে। হ্রদের তীর থেকে ডাঙার একটু ভেতরে এসে প্রবেশ করে সে। সেখানে এসে দ্যাখে, একটা ঘেরাও-করা জায়গায় কতগুলো আরবি ঘোড়া নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। সে ভেবে, দেখলে যে, পায়ে হেঁটে এই অজানা দেশে যাওয়ার চাইতে ঘোড়াটার পিঠ করে সওয়ার হয়ে যাওয়া তার পক্ষে অনেক বেশি

নিরাপদ হবে; তৎক্ষণাৎ সে একটি ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ে বসে দ্রুত তাকে ছুটিয়ে দেয়। লোকালয় ছাড়িয়ে সে তখন মরুভূমির দিকে এগোয় : এটাই তার পক্ষে সুবিধাজনক বলে মনে হয়। প্রতিমুহূর্তেই সে আশা করেছিলো এই বুঝি বেলুনটাকে দেখা গেলো, কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। আর তাতেই কি পার পাওয়া গেছে? দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন পেছনে-পেছনে একপাল শাগরেদ নিয়ে আসে। হঠৎ এক বেদুইনদের ঘোড়সোয়ার বাহিনীর সামনে পড়ে যায় সে–দস্যুতাই তাদের প্রধান বৃত্তি, পথে লোকজন দেখলে তাকে মেরে ফেলে তার সব জিনিশপত্র লুঠপাট করে নেয়াই তাদের পেশা। তারা যখন তুমুল চ্যাঁচামেচি করে তার পেছনে নিলে, প্রাণের ভয়ে কোনোদিকে দৃকপাত না-করে সোজা সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় সে। এই হলো তার কাহিনীর সারমর্ম। পরের ঘটনা তো আপনারাই ভালো জানেন, বলে সে থামলে।

জো যে অকুতোভয় এবং দুঃসাহসী, বহু অভিযানে তাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন বলে যাণ্ডসন তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু এখন জো তাদের জন্যে যা করেছে, ফার্গুসন তার কোনো তুলনা খুঁজে পেলেন না।

বেলুন তখন বিস্তীর্ণ এক মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। নিচে দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকার নানারকম জীব-জন্তু-জিরাফ, জিব্রা, উটপাখি, হরিণ এবং আরো কত-কী। ধীরে-ধীরে রক্তিম মরুপ্রান্তর পেরিয়ে শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ বনভূমি উন্মোচিত হয়ে পড়লো তাদের চোখের সামনে।

রাত দশটার সময় আড়াইশো মাইল অতিক্রম করার পর ভিক্টরিয়া যেখানে এসে থামলো, এককালে সেখানে প্রসিদ্ধ এক শহর ছিলো। চাঁদের আলোয় তার ঝাঁপসা মসজিদ, গোল

মিনার আর ঝোলানো অলিন্দের ধ্বংসাবশেষ অতীতের সমৃদ্ধির স্মৃতি নিয়ে বিষণ্ণভাবে পড়ে আছে। শহরের বাড়ি মিনার মসজিদ সবই এখন ভাঙাচোরা ও পরিত্যক্ত; অথচ এককালে এখানে প্রাচীন এক সভ্যতার সোনার যুগ কেটেছে লোকজনের উচ্চকিত ভিড়ে, হামামের গন্ধভরা পরিমলে, আর মিনারের বুরুজের সোনালি আলোর ঝলমলানিতে।

অস্পষ্ট উষাকালেই আবার ভিক্টরিয়ার যাত্রা শুরু হলো। কাজ রয়েছে তার। কাজ, দায়িত্ব, বাধ্যতা; কাজেই প্রচীন সেই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় আছে নাকি তাদের?

সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে আর কতদিন

সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে আর কতদিন লাগবে আমাদের?

কোন্ সমুদ্রতীরে? এখন অবশ্য কিছুই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে টিমটু এখনও প্রায় চারশো মাইল পশ্চিমে।

হাওয়া অনুকূলে ছিলো, আর তার গতিও ছিলো প্রবল; তার ফলে রাতের প্রথম ভাগের মধ্যেই পশ্চিম দিকে আরো দুশো মাইল এগিয়ে গেলো ভিক্টরিয়া। পালা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে রুপোলি; অদূরে হমবির পর্বতের গগনচুম্বী শিখরদেশ : তার ওপর রুপোর পাতের মতো গলে-গলে পড়ছে জ্যোৎস্না।

সেদিন বিশ তারিখ। অজস্র নদীনালা ঝরনা খালবিল পেরিয়ে গেলো বেলুনআফ্রিকিদের ছোটো-বড়ো বস্তিও দেখা গেলো অনেকগুলো তাদের সবকটিকে একেকটি ছোটো-ছোটো জ্যামিতিক নকশার মতো দেখাচ্ছে, কখনও বাঁকা আর সোজা রেখায় আঁকা, কখনও-বা বহু কালো-কালো ফুটকিতে ঘিরে রয়েছে জনপদের চৌকো সীমানা, কোনোটা আবার গোল বৃত্তের মতো। জায়গাটার নাম কা-বাবা, টিম্বাটুর রাজধানী, নাইজার নদী থেকে পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো টিম্‌বাক্‌টু; এ-দেশী ভাষায় লোকে তাকে বলে মরুভূমির রানী। পাখির মতো শুন্য থেকে মরুভূমি এই রাজ্ঞীকে তাদের চোখে পড়লো : বড়ো অবহেলিত মনে হলো নগরটি। বেলুন থেকে সব খুদে মাপে দেখা যায় বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা আন্দাজও পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট সব সরু-সরু। দুপাশে

রোদে শুকনো ইট, লতা ও পাতা খড়ের ছাউনি দিয়ে বানানো একতলা বাড়ির সারিটুকুও ভারি দুঃস্থ ও গরিব দেখালো তাদের চোখে।

এতদূর এসে পড়ায় ফার্গুসন খুব খুশি হলেন। ঈশ্বর এখন আমাদের যেদিকেই নিয়ে যান না কেন, আমাদের আর-কোনো অভিযোগ নেই!

যেদিকে খুশি-এ-কথাটা কি ঠিক হলো? বরং বলো—সোজা পশ্চিম দিকে যেতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছের আর দাম কী? আমাদের নিজেদের শক্তি আর কতটুকু?

কেন বলো তো?

গ্যাস ক্রমশ ফুরিয়ে আছে। হিশেব করে দেখলুম, ভিক্টরিয়ার ভেসে থাকার ক্ষমতা আস্তে-আস্তে কেবল কমেই যাচ্ছে। যদি পশ্চিম উপকূলে পৌঁছুতে চাই, তাহলে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের, হয়তো বেলুন হালকা করার জন্যে সবগুলি পাথরের বস্তা ফেলে দিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্যাস একটুও বাজে-খরচ না-হয়।

সেই রাতেই ফার্গুসন সব পাথর-ভরা বস্তা ফেলে দিলেন। পুরো দমে গনগনে। করে আগুন দিলেন চুল্লিতে যার গোল ঘুলঘুলি দিয়ে রগরগে এক লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল দোলনার ভেতর। টিম্বাটুর দক্ষিণে প্রায় ষাট মাইল এগিয়ে গেছে বেলুন। হয়তো আগামী কালই নাইজার নদী যেখানে মস্ত চওড়া বাঁক ফিরেছে সেখানে গিয়ে ডেবো নামক হ্রদে পৌঁছুতে পারবেন তাঁরা।

কিন্তু তাদের সব আশাকে ব্যর্থ করার জন্যেই যেন হঠাৎ একখণ্ড প্রচণ্ড বাধা এসে হাজির। কোনো পূর্বাভাস না-দিয়েই হঠাৎ এক পাগলা হাওয়া তা-হো-মের অঞ্চলের দিকে তাড়া করে নিয়ে গেলো ভিক্টরিয়াকে। মারাত্মক হিংস্র ধরনের লোক বাস করে এখানে; নৃমুণ্ডশিকারী হিশেবেই তারা পরিচিত। সাধারণ কোনো উৎসবের দিনেই ডাইনিপুরুৎ আর রাজার নির্দেশে হিংস্র উল্লাসে এখানে হাজার-হাজার মানুষ কোতল করা হয়। সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো মানেই নির্বিচারে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া।

অত্যন্ত ধীরে-ধীরে কোনোক্রমে প্রায় সোয়া-শো মাইল এগিয়ে গেলো বেলুন। এবারে অন্য-একটি বিপদের সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে, ক্রমশই চুপসে লম্বা হয়ে গিয়ে তার গোল চেহারা হারিয়ে ফেলছে বেলুন, আর হাওয়ার ধাক্কায় সেই চুপসোতে-থাকা বেলুনের গায়ে নানা স্থানে গর্তের মতো নেমে এসেছে রেশমের আবরণ।

আর থাকতে না-পেরে ভীত গলায় কেনেডি তার আশঙ্কা প্রকাশ করে ফেললেন, বেলুন কি ফুটো হয়ে গেলো নাকি?

না, ফার্গুসন ভালো করে লক্ষ করে জানালেন, যে গাটাপার্চার খোল ছিলো বেলুনের গায়ে, তা গরম হয়ে নানা জায়গায় গলে গেছে—ফলে সে-সব জায়গা দিয়ে একটু-একটু করে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই ফুটোগুলোকে তবে বন্ধ করা যায় কী করে?

উঁহু! এখন আর তার কোনো সুযোগ নেই। তবে একমাত্র যা আমরা এখন করতে পারি, তা হলো, ক্রমশ বেলুনক নির্ভার করে ফেলা; যা-কিছু বাড়তি ওজন আছে বেলুনে, সব ফেলে দিয়ে তাকে যদি হালকা করতে পারি, তাহলেই হয়তো একটু উপকার হতে পারে।

আমার কী মনে হয়, জানো, ফার্গুসন? এর চেয়ে বোধহয় নিচে নেমে গিয়ে এটাকে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে নিলেই ভালো হবে।

এখন আর একে মেরামত করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার সাধ আর সাধ্যের মধ্যে এখন ক্রমেই মস্ত ব্যবধান গড়ে উঠছে। তাছাড়া নামা মানেই যে মৃত্যু, তা কি তুমি বুঝতে পারছে না? ঐসব গাছে ঐ যে লতাপাতা দিয়ে বাসা বানানো হয়েছে, দেখছে সেগুলো?

কীসের বাসা ও-সব? পাখির?

পাখির বাসা হলে তো ভালোই হতো—এমনকী ঐ ঈগলদের আস্তানা হলেও তবু একটা কথা ছিলো। আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র জংলিরা ঐসব গাছে বাসা বেঁধে বাস করে। একবার তাদের পাল্লায় গিয়ে পড়লে স্বয়ং ঈশ্বরও আর রেহাই পাবেন কি না সন্দেহ। নদী থেকে আমরা আর বেশি দূরে নেই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেটুকু পথও বোধহয় আর আমরা যেতে পারবো না। সেই ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত বেলুনের নেই। এখন।

যেমন করেই হোক নদীর তীরে গিয়ে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। ফার্গুসন তাঁর মানসিক উত্তেজনা বহু কষ্টে দমন করে রাখলেন। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলছে আরেকটি বিপদের আশঙ্কা।

পর-পর বেশ কতগুলি পাহাড় পেরুতে হবে আমাদের। কিন্তু সে-পরিমাণ গ্যাস আমাদের নেই, তা ছাড়া উপর্যুক্ত তাপ সৃষ্টি করতে না-পারলে বেলুনও বেশি ওপরে উঠতে পারবে না, অথচ সেইটুকু তাপ তৈরি করারও ক্ষমতা নেই।

পাহাড়গুলোকে তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা, কোনোরকমে এড়িয়ে যাওয়া যায় এদের? কেনেড়ি ভালো করেই জানেন যে তা সম্ভব নয়, তবু কিছু-একটা বলা দরকার মনে করেই কথাটা বললেন। এই কালো গিরিমালা যেভাবে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িযে আছে তাতে তাদের এড়িয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কেনেডির মনে হলো, যেন শুধু তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্যেই এই পাহাড়গুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তার কোনো উপায় নেই। ফার্গুসন সোজাসুজি বলে দিলেন কথাটা। জো, একদিনের উপযোগী জল রেখে পিপেশুঙ্কু সব জল ফেলে দাও। তাতে হয়তো কিছুটা ওপরে উঠবে বেলুন।

নিমেষের মধ্যে প্রভুর আদেশ পালন করলে জো। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুবিধে হলো না, মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপরে উঠলো বেলুন। ক্রমশই ভিক্টরিয়া পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবো কয়েক শো ফিট ওপরে উঠতে না-পারলে মারাত্মক একটি সংঘর্ষ একেবারে অনিবার্য।

খালি বাক্সগুলি ফেলে দিলেই হয়। কেনেডি মৃদু গলায় বললেন, পাউণ্ড পঞ্চাশেক হালকা হলো বেলুন, আরো কিছু ওপরে উঠলো ভিক্টরিয়া। কিন্তু এখনও পাহাড়ের চুড়ো অতিক্রম করার মতো উচ্চতা লাভ করেনি সে। গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা ভাবতেই সবাই শিউরে উঠলো। একের পর এক অতবার মরণের হাত থেকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। নিয়তি কি এবারও শেষ মুহূর্তে দয়া করবে না তাদের? পাহাড়ের কঠিন বন্ধুর গায়ে ধাক্কা লাগলে যে-পরিণাম হবে, তার কথা কেউ আর ভাবতেই চাইলেন না। আগে যতবারই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন কোনোবারই এমন অক্ষম হতাশায় ভরে যাননি কেউ। বেলুন পাহাড় থেকে আর বেশি দূরে নেই। ক্রমেই সেই মস্ত কালো পাহাড় এগিয়ে আসছে তাদের দিকে—এমনভাবে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে শিরদাঁড়া বেয়ে কেবল একটা ঠাণ্ডা স্রোত কিলবিলিয়ে ওঠা-নামা করতে লাগলো। যদি পার না-হতে পারেন তাহলে আর দশ মিনিটের মধ্যে ফার্গুসনের এত হৈ-চৈ তোলা ভৌগোলিক অভিযান মর্মান্তিকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে!

সব জিনিশ ফেলে দাও, সব জিনিশ ফেলে দাও! ফার্গুসন আর্তস্বরে প্রবল ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন।

চরম মুহূর্তটির দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে ভিক্টারিয়া। ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন, তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও, ডিক!

অসীম মমতায় তার বন্দুকগুলিকে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন কেনেডি। তার এতদিনের সঙ্গী এরা! বন্দুক ফেলবো? বলছো কী তুমি?

বাঁচতে গেলে এখন ফেলে দিতেই হবে।

জো চেঁচিয়ে উঠল। সর্বনাশ হলো। আর-তত বেশি দূরে নেই!

স্পষ্ট দেখা গেলো, শ্যাওলা-জমা কালো চোখা থ্যাবড়া পাথরগুলো ক্রমশ প্রবল বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বেলুন থেকে পাহাড়ের চুড়ো এখন প্রায় ষাট ফিট উঁচু। কম্বল, পোশাক-আশাক, গোলা-বারুদও জো দ্রুত হাতে ফেলে দিলে। একঝটকায় বেলুন পাহাড়ের চুড়োর ওপরে চলে এলো—এখন দোলনাটা ঠিক চুড়োবরাবর চলেছে। দোলনাটার সঙ্গে এই বুঝি পাহাড়ের ধাক্কা লাগলে! আরোহী তিনজন মুহূর্তের জন্য কুঁকড়ে গেলেন। তার পরেই উম্মত্তের মতো চীৎকার করে উঠলেন ফার্গুসন ডিক! ডিক! শিগগির তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও! নয়-তত আমরা সবাই মরবো!

কেনেডির চোখ জলে ভরে গেলো। কোনো দ্বিরুক্তি না-করে তিনি বন্দুকগুলো তুলে ছুঁড়ে ফেলার জন্য হাত তুললেন, কিন্তু হঠাৎ চীৎকার করে জো তাকে বাধা দিলে–থামুন মিস্টার কেনেডি! এক মিনিট! এই বলেই দোলনার দড়ি ধরে, ডিগবাজি খেয়ে, লাফিয়ে, নিচে নেমে গেলো।

জো! জো! এ কী করলে তুমি!

কী সর্বনাশ!

বেলুন আরেকটু ওপরে উঠে এলো। চুড়োর দিকটা প্রায় কুড়ি ফিট চওড়া, অন্য দিকটা কম ঢালু, সেইজন্যে একেবারে চোখা ছুঁচোলো নয়। নিরাপদেই শুধু হালকাভাবে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সেই ভীষণ পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে গেলো বেলুন।

পেরিয়ে গেছি! পেরিয়ে গেছি।

কেনেডি আর ফার্গুসন চোখ বুজে ফেলেছিলেন, নিচে থেকে জোর গলা কানে আসতেই হতবাক আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলেন, পাহাড়ের চুড়োয় হেঁটেহেঁটে চলেছে জো, দু-হাতে গায়ের জোরে দোলনাকে ঠেলে-ঠেলে সে এগুচ্ছে। যেই দোলনা চুড়ো পেরিয়ে এলো, অমনি শরীরের সব শক্তি সংহত করে প্রবলভাবে এক ধাক্কা দিয়ে ফের দড়ি বেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো সে দোলনায় উঠে এলো!

খানিকক্ষণ নির্বাকভাবে তাকে লক্ষ করে ফার্গুসন বললেন, তোমার ঋণ কিছুতেই শোধ করার নয়, জো! বারেবারে তুমি আমাদের নিজের জীবন তুচ্ছ করেও বাঁচিয়ে দিচ্ছো! তারপর তিনি আর-কিছু বলতে পারলেন না, গলা ধরে এলো।

বেলুন এবারে কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে

বেলুন এবারে কিন্তু পাহাড় পেরিয়েই নামতে শুরু করে দিলে, নিচে পড়লো বিরাট এক বনভূমির কালো বিস্তার।কোনো-একটা গাছে বেলুনটি বেঁধে রেখে রাত কাটাতে হবে আমাদের, ফার্গুসন সঙ্গীদের তার সিদ্ধান্ত জানালেন, মাটিতে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সন্ধে হতেই হাওয়া পড়ে গেলো। আকাশের তারা দেখে ফার্গুসন হিশেব করে দেখলেন, সেনেগল নদী থেকে এখনও সাতশো মাইল দূরে আছেন তারা। সেনেগল নদীর ওপর কোনো সেতু নেই, যদি থেকেও থাকে তবে তার খোঁজই বা পাবেন কোথায়, অথচ নদী তাঁদের পেরুতেই হবে এবং পেরুতে হবে এই বেলুনে করেই। ফার্গুসন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক্রমশ যেভাবে বেলুন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তাতে এই অবস্থায় ঐ মস্ত নদী পেরুবার কথা ভাবা নিছকই এক অমূল কল্পনা। শেষটায় অনেক ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শোনো, আমাদের যে করেই হোক এই বেলুনে করেই নদী পেরুতে হবে, কিন্তু এই অবস্থায় বেলুনে করে নদী পেরুবার কথা ভাবাও বাতুলতা। বেলুনকে যাতে আরো হালকা করা যায়, তারই চেষ্টা করতে হবে আমাদের। গ্যাস বাড়াবার যে-সব যন্ত্রপাতি আছে ওগুলোকে এবার খুলে ফেলা যাক, তাতে তো আর কিছু না-হোক অন্তত ন-শো পাউণ্ড ভার কমে যাবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায়ই তো আমার চোখে পড়ছে না।

কিন্তু তাহলে আমরা গ্যাস বাড়াবো কী করে? আর গ্যাস ছাড়া তোমার এই আকাশযান উড়তে পারবে নাকি? গ্যাসই তো তার অদৃশ্য ডানা।

অন্যভাবে ওড়াবার ব্যবস্থা করতে হব। ফার্গুসন বললেন, বেলুনের ভেসে থাকার ও বহন করার ক্ষমতা আমি ভালোভাবে হিশেব করে দেখেছি। অল্প-কিছু জিনিশপত্র আর আমাদের তিনজনকে নিয়ে বেলুন এখনও কিছুদূর অব্দি যেতে পারবে। আমাদের তিনজনেরই ওজন এ-ক-দিনের ধকলে অনেক কমে গেছে-কিছুতেই সবশুন্ধু পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি হবে না আমরা।

ছোটো-ছোটো অংশে ভাগ করে সব যন্ত্রপাতি খুলে ফেলতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেলো। বড়-বড়ো কাজের চাইতে সাধারণত ছোটোখাটো খুচরো কাজেই সময় বেশি লাগে! কিন্তু কোনো উপায় নেই—এই সময়টুকু দিতেই হলো তাদের, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এইভাবে শেষকালে অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়ে বেলুন আবার আকাশে ওড়বার ক্ষমতা ফিরে পেলে।

রাতে সামান্য-কিছু খেয়ে নেবার পর যথারীতি জো আর কেনেডির পাহারা দেবার পালা এলো। স্তব্ধ জ্যোৎস্নাঢাকা রাত। মাঝে-মাঝে ঝাঁপসা মেঘ এসে পাৎলা এক আবরণ বিছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের গায়ে, তারপরেই আবার রুপোর পাতের মতো গলেগলে নেমে আসছে নরম আলোর ধারা। তন্দ্রাহীন চোখে সেই নিশুতি রাতের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন. ফার্গুসন। ধীরে-ধীরে তার শোরগোল-তোলা ঐতিহাসিক অভিযান শেষ হয়ে আসছে। যতই তিনি এ-কথা ভাবলেন ততই তার মনের ভেতর উত্তেজনার আভাস লাগলো। কী-রকম যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করলেন তিনি। রাতের স্তব্ধতায় কী-রকম একটা উশখুশ ভাব ছড়িয়ে আছে যেন। হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে—এই কালো বনের ভেতরে হঠাৎ এই-প্রথম তিনি ক্লান্তি আর অবসাদ অনুভব করলেন-শারীরিক শ্রান্তি নয়, সমস্তটাই মানসিক। ডিক হয়তো ঠিকই বলতে তাঁকে, এখন

কিছুদিন ঘরে বসে শান্তভাবে দিন কাটালে হয়। নিজেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন নিজের এই ভাবনায়। এতটা অবসাদ কোনো অভিযানের পরেই তিনি কখনও অনুভব করেননি। এটা ঠিক যে অন্যান্য বারেও অভিযানের শেষ পর্যায়ে পোঁছে তিনি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করতেন, একটু বিশ্রাম করার জন্যে সমস্ত দেহ মন উন্মুখ হয়ে উঠতো; কিন্তু এমনভাবে তা কখনও তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। হয়তো এই কালো বন, তার ঝাঁপসা রাত্রি আর ছমছমে স্তব্ধতা—সব এখন তার বুকে একসঙ্গে চেপে বসেছে বলেই এমন-সব কথা মনে পড়ছে তার।

হঠাৎ একটা খশ-খশ শব্দ কানে এলো। দূরে তাকিয়ে অন্ধকারে একটু রক্তিম আলোকরেখা দেখতে পেলেন ফাণ্ডসন। দুরবিন তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন-কিন্তু সন্দেহজনক আর-কিছুই তার চোখে পড়লো না। দুরবিন নামিয়ে রেখে আবার তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃতির ভিতর তলিয়ে গেলেন। কেনযে এতকাল তিনি বারেবারে ঘরের আরাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, এখন যেন তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। এই স্তব্ধ রাতের ঝাঁপসা রশ্মিজ্বলা মেঘগুলি যেন তাকে এখন এই বুনো রাতটায় বলে দিলে তার রক্তের এই চঞ্চলতার কারণ। কে যেন এক টানে পর্দা তুলে দিয়ে সব উন্মোচিত করে দিয়েছে তার চোখের সামনে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ, একা-একেবারে একা, আর সেইজন্যেই তিনি সর্বত্র উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়িয়েছেন, যাতে কোনোরকমে এই একলা মুহূর্তগুলিকে ভুলে থাকা যায়। এখন তার মনে হলো সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো, দিগন্ত থেকে দিগন্তে তাঁকে তাড়া করে নিয়ে এলো তার নিঃসঙ্গতা; খ্যাতি পেয়েছেন, বিত্ত, যশ, সম্মান-সব তাকে অকৃপণভাবে দিয়েছে ভাগ্য, কিন্তু সেই স্নেহসূচক পদার্থটি থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, যার অভাবে সবই নিষ্ফল হয়, যাকে বলে মায়ামমতা ভালোবাসা, অন্যকারু সঙ্গে অন্তরঙ্গ

কোনো সম্পর্ক। শূন্য চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। যথাসময়ে কেনেডিকে ঘুম থেকে তুলে পাহারায় বসিয়ে দিয়ে জোর পাশে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পরে সুপ্তি এসে তাকে তার সব অভাববোধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো এমন-এক মায়ালোকে যেখানে কোনো সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সব হতাশা যেন মুক্তোর মতো ঝলমল করে উঠে অসীমের দিকে বিচ্ছুরণ পাঠিয়ে দেয়।

পাহারা দিতে বসে কেনেডিরও কেন যেন কালো বনের এই ভারি স্তব্ধতাকে বড় অস্বস্তিকর বলে বোধ হলো। মোলায়েম মৃদু হাওয়ায় একটু-একটু করে দুলে উঠছিলো বেলুনের দোলনা। এই দোল কেনেডির চোখে ঘুম মাখিয়ে দিয়ে গেলো যেন—অনেক বার দুই হাতে চোখ কচলে তিনি জেগে থাকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিদ্রার আকর্ষণ তার চেয়েও বেশি, সে তার মন্ত্র-পড়া অন্ধকারে তাকেও একসময়ে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কতক্ষণ যে এভাবে ঘুমিয়েছিলেন, জানেন না। হঠাৎ দোলনার নিচে প্রবল একটি শব্দ হতেই কেনেডির ঘুম ভেঙে গেলো লাফিয়ে উঠে বসলেন, তিনি, আর সঙ্গেসঙ্গে ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কে তার সারা মুখ যেন কাগজের মতো শাদা হয়ে গেলো। কে যেন একচুমুকে তার শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। আগুন ধরে গেছে সারা বনে!

আগুন! আগুন। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন কেনেডি।

তাঁর সেই আর্তনাদ যেন অনেক, অনেক দূর থেকে এসে পৌঁছুলো ফার্গুসনের কাছে। প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারেননি, আর্তনাদটা ছিলো যেন স্বপ্নেরই মধ্যে, তারপরে যেই তন্দ্রা ও চটকা ভেঙে গেলো, সচমকে এস্ত উঠে তিনি জিগেস করলেন : কী! কী হয়েছে?

আগুন কে লাগালে? ফার্গুসন ফিশ-ফিশ করে জিগেস করলেন।

আর ঠিক এমন সময়ে এক বিলম্বিত কান-ফাটা চীৎকারে মস্ত বনের পরিপূর্ণ স্তব্ধতাটা যেন ছিড়ে, চিরে, ফেঁড়ে গেলো। জংলিদের চীৎকারই তাদের স্পষ্টভাবে বলে দিলে এই ভীষণ আগুনের পেছনে কারা রয়েছে। এটা বুঝতে বাকি রইলো না যে, জংলিরা তাদের জ্যান্ত ঝলসে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই অতর্কিতে সারা বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

বেলুনের চারদিকে আগুন সাপের মতো তার লকলকে লেলিহান জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে। মটমট করে পুড়ে ভেঙে যাচ্ছে ডালগুলো, অদ্ভুতভাবে শব্দ হচ্ছে সবুজ ডালগুলি পুড়তে, পাতাগুলি পুড়ে গিয়ে ফুলকি আর ছাই উড়ছে চারপাশে : বীভৎস আর ভয়ানক একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে চারদিকে। ঢেউয়ের মতো হাওয়ায় কেঁপেকেঁপে উঠছে লাল শিখা, আর রশ্মিগুলো তাদের লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে তিনজন আরোহী সমেত ভিক্টরিয়ার গায়ে। হঠাৎ এক দমকা হাওয়া সব তাপ আর শিখাকে যেন বেদম তাড়া দিয়ে বেলুনের দিকে নিয়ে এলো।

শিগগির উড়ে পালাই, চলো! কেনেডি তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, নয়তো এসো নিচে নেমে পড়ি! তা ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর-কোনো রাস্তা নেই।

ফার্গুসন তক্ষুনি দৃঢ় মুঠোয় কেনেডির হাত চেপে ধরলেন, আর ইঙ্গিত অনুযায়ী জো দড়ি কেটে দিয়ে বেলুনকে মুক্ত করে দিলে।

শিখারা সব লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে ওপরে, এই বুঝি ছুঁয়ে দিলে বেলুনকে। প্রচণ্ড তাপ আসছে হাওয়ার ঢেউয়ে ঝাঁপটায়, হিল্লোলে। দড়ি কাটার পর মুহূর্তেই-বেলুন এক

ঝাঁপটায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এলো। নিচে থেকে ভীষণ শারগোল উঠলো, এমন ভীষণ, যে এত ওপরেও তার সামান্য রেশ এসে পৌঁছুলো। বেলুন তখন নিরাপদে অনেক উঁচু দিয়ে পশ্চিম দিকে ভেসে চলেছে।

জিনিশপত্র সব ফেলে দিয়ে বেলুনকে হালকা

যদি, কাল আমরা জিনিশপত্র সব ফেলে দিয়ে বেলুনকে হালকা না-করতুম, তাহলে এতক্ষণে আমাদের যে কী পরিণতি হতো, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

এখনও অত ভয় পাচ্ছো কেন তুমি? আমরা তো সব পেরিয়ে এলুম। তোমার অনুমতি ছাড়া এখন আর বেলুন নিচে নামবে না।

তা জানি। কিন্তু নিচে তাকিয়ে দ্যাখো একবার। ফার্গুসন বললেন।

বনের সীমান্ত যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে চল্লিশজন ঘোড়সোয়ার রে-রে করে ছুটে আসছে। তাদের কারু হাতে বল্লম, কারু হাতে বন্দুক। ভিক্টরিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তারা তলা দিয়ে। মাঝে-মাঝে ওপর দিকে তাকিয়ে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করছে। তাদের রাগি চঁচামেচি শুনে মনে হলো একবার ধরতে পারলে তারা যেন সব্বাইকে ছিড়ে-খুঁড়ে ফেঁড়ে ফেলবে। অসমতল উঁচু-নিচু পথ দিয়ে অসীম ক্ষিপ্রতায় অনায়াসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসছে। তারা পুরোদমে জোরকদমে।

ফার্গুসন জানালেন, এরা হলো নিষ্ঠুর ট্যালিবাস-জাতীয় জংলি, আফ্রিকার অন্যতম ভীষণ জাতি। কোনোকিছুতেই বাগ মানে না, পোষ মানে না, নরম হয় না। কালোদেরও এরা রেহাই দেয় না। আমি বরং বুনো জানোয়ারদের সামনেও পড়তে রাজি, কিন্তু এদের সামনে নয়। পশুর চেয়েও হিংস্র এরা, কোনোরকম মানবিক মূল্যবোধই নেই এদের।

ওদের চেহারাছিরি চালচলন দেখে তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হয়। কী ভীষণ দেখতে একেক জন! আর চাউনিতে যেন আগুন জ্বলছে! ভাগ্যিশ ওরা উড়তে পারে না—নইলে আর দেখতে হতো না।

ঐ পোড়া গ্রামগুলো দেখতে পাচ্ছো-ধসে চুরমার হয়ে পড়ে আছে? সব এদের কীর্তি। যে-সব জমিতে এককালে সোনালি ফসল দুলে উঠতো হাওয়ায়, আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে দিয়ে কেবল কালো ছাই আর পোড়া মাটি রেখে দিয়ে গেছে এরা।

আমাদের ওরা ধরবে কী করে? একবার নদীর ওপারে পৌঁছুতে পারলেই তো নিরাপদ।

ঠিকই বলেছে। এখন ঈশ্বর যদি দয়া করেন, তাহলেই হয়। বেলুনের ক্ষমতায় এখন আর-কোনো আস্থা নেই আমার। যে-কোনো মুহূর্তে সব গ্যাস শেষ হয়ে বেলুন নিচে নেমে পড়তে পারে। আর, একবার নামলেই আর-কোনো কথা নেই, চক্ষের পলকে এই দস্যুরা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

সারা সকালটা ফেউয়ের মতো দস্যুরা তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাড়া করে এলো। বেলা এগারোটার সময় হিশেব করে দেখলেন, এতক্ষণে মাত্র পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেছেন।

এমন সময় বিপদের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দেবার জন্যেই যেন দিগন্ত থেকে, হাতির মতো কালো শুঁড় বাড়িয়ে, এগিয়ে এলো মেঘ। ঝড়ের আশঙ্কায় ফার্গুসন রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঝড় যদি আবার তাদের নাইজারের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাহলে আর রেহাই নেই। আর অবস্থা যখন এইরকম, তখন বেলুনও যেন চক্রান্ত করলে

তাদের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট দেখা গেল ক্রমশ সে নিচের দিকে নেমে আসছে। যাত্রা শুরু করার পর থেকে এতক্ষণের মধ্যে প্রায় তিনশো ঘন ফিট গ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও কম করেও বারো মাইল দূরে রয়েছে সেনেগল নদী। বেলুন যে-হারে অতি ধীরে-ধীরে এগুচ্ছে, তাতে অন্তত আরো ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে।

এদিকে নিচে অনুসরণকারী দস্যুদের বিকট চীৎকারে ক্রমশ উল্লাসের ভাব জেগে উঠলো। তার কারণ আর কিছুই নয়, বেলুন এখন ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। মিনিট পনেরো মধ্যেই দোলনা মাটি থেকে প্রায় দেড়শো ফিট ওপর দিয়ে চলতে লাগলো; তবে হাওয়ার সাপট একটু বেশি বলে, এখন তার গতি আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেড়েছে। দস্যুরা এখন থেকেই বেলুন তাগ করে মুহুর্মুহু গুলি চালাতে শুরু করে দিয়েছে। ভার বা ব্যালাস্ট আর না-কমালে রেহাই নেই। ফার্গুসনের নির্দেশে শেষখাদ্যটুকুও ফেলে দেয়া হলো। সঙ্গে-সঙ্গে বেলুন ওপরে উঠে গেলো বটে, কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার নিচের দিকে নামতে শুরু করে দিলে বেলুনের রেশমি খোলটা দু-এক জায়গায় ফেঁশে গিয়েছে, তাই দিয়ে ই-ই করে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলেই বেলুনের নিচের দিকে টানটা আগের চেয়ে আরো দ্রুত হয়ে উঠেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দোলনা মাটি স্পর্শ করলো; সঙ্গে-সঙ্গে হৈ-হৈ করে দস্যুরা ছুটে এলো সেদিকে। কিন্তু এ-রকম সময়ে সাধারণত যা হয়ে থাকে তা-ই ঘটলো–মাটিতে ধাক্কা খেয়ে বেলুন বলের মতো তক্ষুনি আবার বিপরীত আঘাতে আকাশে লাফিয়ে উঠে প্রায় মাইলখানেক ভেসে গেলো।

নাঃ, দস্যুদের হাত থেকে দেখছি কিছুতেই নিস্তার নেই। অসহায় রাগে কেনেডি নিশপিশ করে উঠলেন।

সব ফেলে দাও-এমনকী শেষ নোঙরটাও ফেলে দাও। ফার্গুসন হেঁকে বললেন।

সব যন্ত্রপাতি ফেলে দেয়া হলো বিশেষ কিছুই ফল হলো না, বেলুন শুধু একটুক্ষণের জন্যে আকাশে উঠে ফের মাটিতে নেমে আসছে। হিংস্র জানোয়ারের মতো প্রবল বেগে ঘোড়ায় চেপে আসছে ট্যালিবাস দস্যুরা। তারা যখন প্রায় দুশো গজের মধ্যে এসে পড়লো ফার্গুসন চেঁচিয়ে বললেন, আর তোমার বন্দুকের মায়া কোরো না, ডিক। চট করে সব বন্দুক ফেলে দাও।

আগে কয়েকটাকে গুলি না-করে ফেলছি না! কেনেডি দস্যুদের লক্ষ্য করে পর-পর কতগুলি গুলি ছুঁড়লেন। অব্যর্থ টিপ তার, কিন্তু এটা কে জানতো যে তার এই অমোঘ উদগিরণ শেষটায় মানুষ শিকারে লাগবে? উৎকট আর্তনাদ করে কয়েকটি দস ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো।

রবারের বলের মতো আবার বেলুন একলাফে আকাশে উঠলো বটে, কিন্তু এঅবস্থায় বেশিক্ষণ চললো না। হঠাৎ এক দমকে অনেকটা গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুন চুপসে গেলো।

সব শেষ হয়ে গেলো তাহলে! আর এখন রক্ষে নেই। কেনেডির গলা হতাশায়। ভাঙা-ভাঙা শোনালো।

না, ফার্গুসন হঠাৎ দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন অস্বাভাবিক একটি দীপ্তিতে হঠাৎ তার চোখদুটি চকচক করে উঠলো। না, এত সহজে হাল ছাড়বো না! আরো-একটি জিনিশের মায়া আমাদের ছাড়তে হবে, তাহলে প্রায় শো-তিনেক পাউণ্ড হালকা হবে ভিক্টরিয়া।

শো-তিনেক পাউণ্ড হালকা হবে? বিমূঢ় হয়ে গেলেন কেনেডি।সেটা আবার কী?

আমাদের দোলনা। শিগগির বেলুনের খোলের দড়ি-দড়া ধরে ঝুলে পড়ো। এমনিভাবে ঝুলেই আমরা নদী পেরুতে পারবো। শিগগির কলোরা, হাতে একটুও সময় নেই!

মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার জন্যে এক অমানুষিক শক্তিতে ভরে গেলেন অভিযাত্রীরা। বেলুনের দড়ি ধরে ঝুলে পড়লেন তারা, আর জো এক হাতে দোলনার দড়ি কেটে দিলে। নিমেষের মধ্যে নিচে আছড়ে পড়লো দোলনাটা, আর বেলুন সে করে একসঙ্গে শো-কয়েক ফিট ওপরে উঠে এলো।

শিকার পালিয়ে যায় দেখে দস্যুরাও তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, পাগলের মতো অনবরত চাবুক মারতে লাগলো তারা ঘোড়ার পিঠে, আর মুখের ফেনা তুলে পুয়োকদমে ছুটতে লাগলো আরবদের বিখ্যাত ঘোড়াগুলি। খুরে-খুরে নীল ফুলকি ছিটিয়ে দিচ্ছে তারা, ফেনার সঙ্গে নিশ্বাসে হলকা ছাড়ছে। কিন্তু ভিক্টরিয়া ততক্ষণে প্রবল হাওয়ার তোড়ে আরো জোরে ভেসে চলেছে, একটু পরেই একটা ছোটো পাহাড় পেরিয়ে এলো সে অনায়াসে। পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার চলার পথ নেই বলে দস্যুরা শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে সেখানেই থেমে যেতে বাধ্য হলো।

পাহাড় পেরিয়েই ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ-যে, ঐ-যে নদী! ঐ দ্যাখো, সেনেগল নদী!

দূরে দেখা গেলো নদীর রুপোলি জলস্রোত ঘুরে-ঘুরে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে, যেন একটা রুপোর তৈরি সজীব তরল সাপ। যেন ধীরে-ধীরে সুন্দর একটি চকচকে সাপ কুণ্ডলী ছাড়িয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বুকে হেঁটে দূরের দিকে চলে যাচ্ছে। তখনও তা প্রায় মাইল-দুয়েক দূরে; নদীটা পুরোপুরি পেরিয়ে যেতে পারলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাগ্য যদি আর তাঁদের জীবন নিয়ে আর কোনো ছিনিমিনি নাখেলে তাহলে আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারা আপাতত নিরাপদ হয়ে যাবেন, আরকোনো আশঙ্কাই থাকবে না প্রাণের।

কিন্তু তা বুঝি আর হয় না।

বেলুনের সব গ্যাসই ফুরিয়ে গেলো

কেননা বেলুনের সব গ্যাসই ফুরিয়ে গেলো একটু পরে। হু-হু করে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে নেমে পড়লো ভিক্টোরিয়া। ছোটো বলের মতো বারেবারে ধাক্কা খেয়ে কয়েকবার ওঠা-নামা করতে-করতে কিছুদূর এগিয়ে গেলো। মস্ত একটি বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে ছিলো একদিকে, শেষটায় তার মগডালে ঠেকে গেলো বেলুন, তার জাল আটকে গেলো তার ডালে, আর তক্ষুনি একেবারে গতিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তবে আর কোনো আশাই নেই! নিশ্বাস ছেড়ে বললেন কেনেডি। সব শেষ হয়ে গেলো।

আর ঠাট্টাটা দ্যাখো একবার! তা কিনা হলো নদীর একশো গজের মধ্যে এসে!

হতভাগ্য অভিযাত্রীরা বেলুনের জাল থেকে নিচে নেমে এলেন। চটপট নদীর দিকে যেতে হবে এবার। মস্ত এক জলপ্রপাতের একটানা আছড়ে পড়ার শব্দে জায়গাটা মুখর হয়ে আছে।

আশপাশে কোনো নৌকো বা জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নেই। নদী এখানে প্রায় দু-হাজার ফিট চওড়া, প্রায় দেড়শো ফিট উঁচু থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে প্রপাতের মতো নেমে এসেছে। জল শুধু তুলকালাম ফেনা ছিটোচ্ছে আর তার ভীষণ গজরানিতে গোটা এলাকাটা ভরে আছে, মাঝে-মাঝে মস্ত সব পাথরের টুকরো চোখা থ্যাবড়া নানারকম কিম্ভুতকিমাকার অদ্ভুত আকার নিয়ে জলস্রোতের ভিতর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সাঁৎরে নদী পেরুবার চেষ্টা করার অন্য নামই হলো সাধ করে মৃত্যুর কাছে

নিজেকে সঁপে দেয়া। দেখেই কেনেডি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। তার আর কোনো উদ্যমই রইলো না, যেন গোটা দৃশ্যটা তার মনের ভিতর এক বিচ্ছিরি হত্যুশে ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তার সব উৎসাহকে বিকল করে দিয়ে গেছে। ফার্গুসনেরও যে খুব-একটা আশা হচ্ছিলো, তা নয়; তবু মুখে অন্তত তিনি বন্ধুকে ভরসা দিলেন। একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তার; যতই বিপদের মুখে পড়তেন, ততই যেন তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে উদ্ধারের ফন্দিগুলো আটতে শুরু করে দিতে। বিপদ যেন তার বুদ্ধিকে শানিয়ে-শানিয়ে তীক্ষ্ণ ও ধারালো করে তুলতে। কতগুলো শুকনো ঘাসের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ আশায় ঝলমল করে উঠলো। হঠাৎ কে যেন একটানে তার মনের ভেতরে পর্দা তুলে দিলো, আর সবগুলো জট নিখুঁতভাবে খুলে গিয়ে একটি ভীষণ ধাঁধার সমাধান হয়ে গেলো যেন মনের ভেতর : নিটোল একটি পরিকল্পনা জেগে উঠলো তার মনে। সবাইকে নিয়ে ফের বেলুনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, আমরা বোধহয় ঐ দস্যুদের চেয়ে ঘণ্টাখানেকের পথ এগিয়ে আছি, কাজেই আর-একটুও সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি কাজে লেগে যেতে হবে। যত পারো শুকনো ঘাস এনে। জড়ো করো। নিনে একশো পাউণ্ড শুকনো ঘাস আমার দরকার।

কেন? তা দিয়ে হঠাৎ আবার কী হবে?

আমাদের বেলুনে তো আর গ্যাস নেই! কাজেই হালকা গরম হাওয়ার সাহায্যে বেলুন ফুলিয়ে আমরা নদী পেরুবো।

পরিকল্পনাটি শুনেই কেনেডির মুখে খুশির আভা ফুটে উঠলো। আবারও একবার বন্ধুর বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে গেলেন তিনি; শতমুখে প্রশংসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো তার।

প্রচুর পরিমাণে শুকনো ঘাস এনে বাওবার গাছের তলায় স্কুপ করে রাখা হলো। বেলুনের মুখটা যথাসম্ভব বড়ো করে ফাঁক করে ধরা হলো—যাতে বাকি গ্যাসটুকু বেরিয়ে যায়, তারপর সেই মুখের তলায় ঘাসের প রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একশো আশি ডিগ্রি আঁচে হাওয়া গরম হয়ে গিয়ে বেলুনের ভিতর প্রবেশ করে ভেতরকার আটকে-পড়া বাতাসকে হালকা করে তুললো, ক্রমেক্রমে তার গোল চেহারা ফিরে পেলে ভিক্টরিয়া। ঘাস আর আগুনের অপ্রতুলতা ছিলো না, কাজেই বেলুন এবার দুলে-দুলে ওপর দিকে ওঠবার জন্যে তৈরি হলো।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, প্রখর কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে মধ্যদিনের রাগি সূর্য, ঘামে তাপে পরিশ্রমে অভিযাত্রীরা তখন শ্রান্ত, এমন সময়ে উত্তর দিকে, বেশ দূরে, সেই দস্যুদলকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেলো। তাদের ঘোড়ার খুরের একটানা খটখট আওয়াজ আর বিকট গলার ভীষণ শোরগোল ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। তখনও আগুন জ্বলছে ঘাসের স্কুপে, কেঁপে-কেঁপে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে স্বচ্ছ শিখা, এত স্বচ্ছ যে চোখে তাদের দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় তাপের একটা স্রোত ঢেউয়েঢেউয়ে ফুলে উঠছে–শুধু ঢেউ আর. শুধু চঞ্চলতা। এদিকে আর-বেশি সময় নেই, মিনিট কুড়ির মধ্যেই দস্যুরা এখানে পৌঁছে যাবে।

ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠলেন, আরো ঘাস দাও, জো! শিগগির! দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের আকাশে উঠে যাওয়া চাই!

ভিক্টরিয়ার তিন ভাগের দুই ভাগ সেই গরম হাওয়ায় ভরে গেছে; একটু-একটু করে ডিমের মতো আকার নিলে তা, তারপর তার পেট মোটা হয়ে গেলো আর অপেক্ষাকৃত রোগা হয়ে গেলো তলার দিকটা।

ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন, আগের মতো এবারেও আমাদের দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে যেতে হবে। শক্ত করে ধোররা কিন্তু।

দশ মিনিট পরেই আকাশে ওঠবার উপক্রম করতে লাগলো বেলুন, স্বচ্ছ নীল হাওয়ায় কেঁপে উঠছে তার শরীর, আর আকাশের প্রখর নীল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে আরো স্বচ্ছ তাপ। ট্যালিবাস দুস্যরা কেবলই শপাং-শপাং করে চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে, চোখ-কান বুজে ছুটে আসছে পুরোদমে, এখন প্রায় পঁচশো গজের মধ্যে এসে গেছে তারা।

শক্ত করে ধরো, দৃঢ় স্বরে ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন।

পা দিয়ে তিনি শেষ ঘাসের আঁটিটা ঠেলে দিলেন আগুনের মধ্যে, আর তারপরেই গরম হাওয়ায় ভরে-ওঠা বেলুনটি এক ধাক্কায় আকাশের দিকে উঠে গেলো। আগুনের শিখারা একবার কেবল লাফিয়ে উঠলো তার নাগাল ধরার জন্যে, কিন্তু বেলুন তখন ভেসে চলে যাচ্ছে শূন্যপথে।

ট্যালিবাস দস্যুরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো। রাগি চ্যাঁচামেচির সঙ্গে এবার তাদের বন্দুকগুলিও শেষ চেষ্টায় প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠলো—একটা গুলি তো প্রায় জো-র কাঁধ ঘেসেই চলে গেলো, কেবল একটুর জন্যে বেঁচে গেলো সে। বেলুন ক্রমশ আটশো ফিট ওপরে উঠে গেলো দেখে দস্যুদের সে কী নিষ্ফল আক্রোশ। কোনো লাভ নেই জেনেও তারা খানিকক্ষণ বেলুন লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে।

জোরালো হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চললো বেলুনকে, দুলতে-দুলতে জলপ্রপাতের ঠিক ওপর দিয়ে নদী পেরুতে লাগলো ভিক্টরিয়া। প্রাণপণে দড়ি ধরে ঝুলে আছেন অভিযাত্রীরা, সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো : হাতের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, আর প্রবল চাপে রক্তিম হয়ে গেছে হাত; দরদর করে ঘামছেন, উত্তেজনায় চোখগুলি চকচকে, আর ফার্গুসনের কাপালের শিরাটা ভীষণ রক্তচাপে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। কেউ কোনো কথা বলছেন না, কেবল প্রবল ইচ্ছার জোরে আঁটো করে দড়ি ধরে আছেন। ধীরেধীরে বেলুন সেনেগল নদীর অপর তীরে গিয়ে নামতে লাগলো।

ফার্গুসন একবার ঈশ্বরের কৃপার কথা স্মরণ করে চোখ মুদলেন।

অবশিষ্ট

ফরাশি উর্দি-পরা একদল সৈন্য নদীর তীরে এসেছিলো কুচকাওয়াজ করতে। নদীর ওপরে একটা বেলুনের দড়ি ধরে তিনজন শ্বেতাঙ্গকে ভাসতে দেখে তারা দস্তুরমতো হতবাক হয়ে সব লক্ষ করছিলো। এই দুর্গম প্রদেশে একটা বেলুনে চেপে কিনা নদীর ওপার থেকে তিনজন ইয়োরোপীয় লোক উড়ে এলো! এই তাজ্জব ঘটনা দেখে তাদের আর বিস্ময়ের কোনো সীমা ছিলো না। কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ইয়োরাপীয় খবর-কাগজে অনেকদিন আগেই ডক্টর স্যামুয়েল ফার্গুসনের দুঃসাহসিক অভিযানের সংবাদ পড়েছিলেন। কাজেই দুই আর দুয়ে যোগ করে এটা চট করে বুঝে নিলেন যে, এঁরা আর কেউ নন, খোদ সেই সুবিখ্যাত অভিযাত্রী এবং তার দুই সঙ্গী।

ধীরে-ধীরে বেলুন চুপসে নেমে আসছে মাটিতে—এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেলো। শেষকালে যদি নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার আগের মুহূর্তেই তাদের মৃত্যু ঘটে! বুঝি-বা সেই দোদুল্যমান অভিযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় মাটিতে পৌঁছোন না! বেলুনটা সামান্য বেঁকে প্রবল স্রোতস্বিনীর জলে নেমে আসছে। তাই দেখে আর তারা চুপচাপ নির্বিকার দর্শক হয়ে থাকতে পারলে না। চট করে কয়েকজন ফরাশি সৈন্য দ্রুত জলে নেমে গিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিযাত্রীদের ধরে ফেললে, আর চুপসে-যাওয়া ভিক্টরিয়া সেই ভীষণ জলস্রোতে পড়ে দ্রুত ভাসতে-ভাসতে চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

দ্রুত পায়ে সেনাপতি এগিয়ে এলেন। ডক্টর ফার্গুসন!

হ্যাঁ, আমারই নাম স্যামুয়েল ফার্গুসন। এঁরা দুজন আমার সঙ্গী, অভিযানের সমস্তটা সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। শ্রান্ত গলায় ফার্গুসন জানালেন। এই শেষ মুহূর্তে, নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে, যেই সব উত্তেজনার সমাপন হলো অমনি এক সারা শরীরভাঙা অবসাদ এসে তার ওপর চেপে বসেছে।

সবাই মিলে ধরাধরি করে তাদের তীরে নিয়ে এলো। কিন্তু তীরে এসেও ফার্গুসন সেই উচ্ছসিত, ফেনিল, পাক-খাওয়া জলধারার দিকে চেয়ে রইলেন; যা তার এতদিনের আশ্রয়, সেই ভিক্টরিয়াকে স্রোতের ওপর ঝুঁটি ধরে অবলীলায় ঘোরাতে-ঘোরাতে দিগন্তের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো জল। ধীরে-ধীরে ঝাঁপসা হয়ে এলো তার চোখ, ছলোছলে করে উঠলো, যেন এখুনি চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে আসবে।

যে-বেলুন তার এই দুঃসাধ্য অভিযানকে অনায়াসে সার্থক করে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এই পাঁচ সপ্তাহ, বাঁচিয়েছে তাদের জংলিদের বল্লম, মরুভূমির তৃষ্ণা, বুনো জানোয়ারের দাঁত, কালো বনের আগুন, বেদুইনদের আক্রমণ আর ট্যালিবাস দস্যুদের নিষ্ঠুর বন্দুক থেকে-তার এই চিহ্নবিহীন পরিণতি এক অপরিসীম বিষাদে তাকে ভরে দিলে! এমনকী স্মৃতিচিহ্নটুকু পর্যন্ত রইলো না! বড়ো ক্লান্ত লাগলো নিজেকে। মনেমনে তিনি ফিশ-ফিশ করে বারেবারে আউড়ে নিলেন, তুমি থাকলে না বটে, কোনো স্মারক পর্যন্ত দিয়ে গেলে না, কিন্তু আমি থেকে গেলুম, তোমার কৃতিত্বের জীবিত নিদর্শন! তোমাকে আমি কোনোদিনও ভুলবো না। তারপর জোর করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন—দিগন্তের কাছে যেখানে নদী বাঁক ঘুরে তার ছলোছলো জল নিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আর তাকাতে পারলেন না, তীব্র এক অভাব-বোধে ও বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁর বুকটা টন-টন করে উঠেছে।

সেনেগল প্রদেশ ফরাশিদের একটি উপনিবেশ-সুদানের কাছেই। এই ফরাশি সেনাদল উপনিবেশের রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে ঐ এলাকায় একটা জায়গা বেছে নিতে বেরিয়েছিলো, যেখানে সৈন্যদের জন্যে একটি ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে। কেননা এ-সব অঞ্চলে দস্যুদের উপদ্রব খুব বেশি—কাজেই সৈন্যদের যত ব্যারাক আর ছাউনি থাকবে, ততই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সুব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সেদিন তারা অমনি এক কুচকাওয়াজে বেরিয়ে নদীর ধারে এসেছিলো, তারপর এই সাক্ষাৎ।

খানিকক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফার্গুসন সেনাপতিকে উদ্দেশ করে বললেন, আমরা যে এখানে বেলুনে করে চব্বিশে মে তারিখে পৌঁছেছি, এই মর্মে একটি সরকারি বিবৃতিতে আপনার স্বাক্ষর প্রয়োজন। আশা করি এইরকম একটা বিবৃতিতে দস্তখৎ করতে আপনার কোন আপত্তি নেই।

নিশ্চয়ই না। আমি এখুনি স্বাক্ষর করছি-আপনার এই অভিযানের সঙ্গে আমার নাম যোগ হলে তো আমারই গৌরব! কিন্তু তার আগে চলুন বিশ্রাম করবেন। আপনাদের দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধাত বলে মনে হচ্ছে—কাজেই সব-আগে আপনাদের বিশ্রামেরই প্রয়োজন এখন।

ফরাশি সেনাবাহিনীর সঙ্গে জো আর ডিক কেনেডিকে নিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন ফার্গুসন বাহিনীর ঘাঁটির দিকে রওনা হয়ে পড়লেন। যেতে-যেতে ভাবলেন, লণ্ডনে পৌঁছুতে আরো কত দিন বাকি! এবারে ফিরে গিয়ে, সত্যি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে হবে।

না-জেনে সেনাপতি-মশাই একটা মস্ত কথা বলেছেনবিশ্রামেরই প্রয়োজন এখন আমার সর্বাগ্রে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে নিজেকে, বড়ো বেশি অবসন্ন।